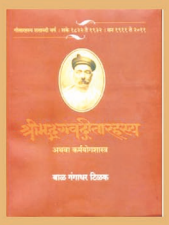

লোকমান্য তিলকের
গীতারহস্যে
জাতীয়তা
—পৃঃ ...১৩

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

সন্ত্রাসবাদের
যমজ স্তম্ভ :
আল কায়দা ও
আইএস —পৃঃ ...২৯

৬৮ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা।। ২৫ জুলাই ২০১৬।। ৯ শ্রাবণ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

গীতারহস্য

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা, ৯ শ্রাবণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

২৫ জুলাই - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

খোলা চিঠি : পাশ ফিরে শোবেন না, বিপদ ওপাশেও ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৯

মুসলিম জেহাদি সন্ত্রাসের মোকাবিলায় রুশ-মার্কিন সামরিক চুক্তিই বিশ্ববাসীর সামনে এখন আশার আলো ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

সিপিআই (এম)-এর রাজনীতি ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১১

লোকমান্য তিলকের গীতারহস্যে জাতীয়তা ▯ ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার ▯ ১৩

গীতার মর্মবাণীই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার মূল ভিত্তি ▯ সুনীল কুমার দাস ▯ ১৭

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও বর্তমান রাজনীতি ▯ সুভাষ মণ্ডল ▯ ১৮

কর্ণাটকে প্রাচীন ভারতের অপরূপ স্থাপত্যকলা ▯ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ▯ ২১

গান্ধী পরিবারের বিভিন্ন কালপর্বের শাসনে দেশ বাড়তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে ▯ কৃষ্ণমূর্তি সুব্রহ্মানিয়ম ▯ ২৭

সন্ত্রাসবাদের যমজ-স্তম্ভ আল কায়দা ও আইএস ▯ মহম্মদ বাজ্জি ▯ ২৯

এন এস সি এন নেতাদের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় সর্তকতা প্রয়োজন ▯ ৩২

কর্মসংস্থানের স্বার্থেই অর্থনীতিতে বিদেশি লগ্নির দরজা খুলল সরকার ▯ তারক সাহা ▯ ৩৫

হিন্দুরা ক্রমশ বাংলাদেশে হারিয়ে যাচ্ছে ▯ ধর্মানন্দ দেব ▯ ৩৭

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ অন্যরকম : ৩৩ ▯ খেলা : ৩৯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ চিত্রকথা : ৪১ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

ভারতের বহিরাগত আত্মীয়

মুসলমানদের মতো পারসিরাও বহিরাগত এবং সংখ্যালঘু। কিন্তু ধর্মের নামে দেশদ্রোহিতার মানসিকতা তাদের নেই। বরং চিনি যেভাবে দুধে গুলে যায়, ঠিক সেইভাবে নতুন মাতৃভূমিকে আপন করে নেওয়ার মতো হৃদয় তাদের আছে। এদেশে পারসিদের হাজার বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রচ্ছদ নিবন্ধ— **ভারতের বহিরাগত আত্মীয়**। লিখেছেন সন্দীপ চক্রবর্তী।

দাম একই থাকছে - ১০ টাকা।

স্বস্তিকা

১৫ই আগস্ট সংখ্যা

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনা : ভবিষ্যতের ভাবনা

ভারতের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি কাশ্মীরের মতো উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও সক্রিয়। কোথাও জনভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে, কোথাও বা সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ তারই সাক্ষ্য বহন করছে। বিষয়টি নিয়ে যৌথভাবে বিশ্লেষণ করেছেন লেঃ জেঃ জে. আর. মুখার্জি এবং জাতীয় গবেষক অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার রায়।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

কাশ্মীরে শান্তি রক্ষার শর্ত

সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনে রাজ্যসভায় দাঁড়াইয়া কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং কাশ্মীর উপত্যকায় অশান্তি ছড়াইবার জন্য পাকিস্তানের উস্কানিসূচক আচরণকেই দায়ী করিয়াছেন। কাশ্মীরের অশান্তির পিছনে পাকিস্তান যে একটি বড় কারণ সেই বিষয়ে রাজ্যসভায় ক্ষমতাসীন ও বিরোধী পক্ষ একমত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই কথা পর্যন্ত বলিয়াছেন যে কাশ্মীরে যেসব অশান্তির ঘটনা ঘটিতেছে তাহার পিছনে কলকাঠি নাড়িতেছে পাকিস্তান। নাম পাক হইলেও কাজকর্ম সবই না-পাক (অপবিত্র)। কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও জঙ্গি কার্যকলাপের পশ্চাতে যে পাকিস্তানের উসকানিমূলক কাজকর্ম দায়ী—এই অভিযোগ প্রথম নহে। পাকিস্তান যে কোনো ভাবে কাশ্মীর উপত্যকায় অশান্তির আগুনে হাওয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে, তাহার একটি টাটকা উদাহরণ হইল জঙ্গি বুরহান ওয়ানির মৃত্যুতে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিজবুল মুজাহিদিনের পক্ষে সেখানে কালাদিবস পালন করা হইয়াছে। যে জঙ্গি বুরহানকে অন্তত ১৫টি অভিযোগে পুলিশ খুঁজিতেছিল, সেই বুরহানের পাশে প্রকাশ্যে পাকিস্তান দাঁড়াইতেছে। কাশ্মীরে আজাদির নামে উস্কানি দেওয়া হইতেছে। ভারতের সঙ্গে সঙ্গে অন্য কয়েকটি দেশও পাকিস্তানকে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজকর্ম সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিলেও তেমন কিছু লাভ হয় নাই। আমাদের নীতি-নির্ধারণকারীদের তাই বুঝিতে হইবে যে শুধু কড়াবার্তার মাধ্যমে কাজের কাজ কিছু হইবে না। কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি কাশ্মীরি যুবকদের কেন সমর্থন লাভ করিতেছে, তাহা খতাইয়া দেখিতে হইবে। দেখা যাইতেছে, এই বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবনার মোকাবিলার ক্ষেত্রে কাশ্মীরের রাজনৈতিক দলগুলিও ব্যর্থ। ইহার কারণ হইল এই সমস্ত দল নিজেদের দায়িত্ব পালন করিতে ইচ্ছুক নহে। আরও উদ্বেগের বিষয় হইল এইসব দলের নেতা-নেত্রীরা মাঝে-মধ্যেই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সুরে কথা বলিয়া থাকেন। কাশ্মীরে জনতা, বিশেষত যুবকদের সঠিক পথের সন্ধান দিতে তাঁহারা ব্যর্থ।

রাজ্যসভায় কাশ্মীর বিষয়ে চর্চার সময় নেতারা নিরাপত্তারক্ষীদের বাড়াবাড়ি অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষমতার ব্যবহার লইয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। শুধু রাজ্যসভায় নয়, এই উদ্বেগ কাশ্মীরের কিছু নেতা, এমনকী মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত প্রকাশ করিয়াছেন। গত দশ দিন কোনো নেতাই এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই যে নিরাপত্তারক্ষীদের উদ্দেশে পাথর ছোঁড়া পাগলামির নামান্তর। এই ভাবে জনতার ভিড় হইতে নিরাপত্তারক্ষীদের দিকে পাথর ছোড়া এবং পিছন হইতে উগ্রপন্থীদের এই কাজে উসকানি দেওয়া এখনই বন্ধ করিতে হইবে—এমন কথাও কোনো নেতার নিকট হইতে শোনা যায় নাই। কাশ্মীর উপত্যকার অবস্থা আরও অবনতি হওয়ার অন্যতম কারণ, জ্ঞানত বা অজ্ঞানত এই ভাবনাকে আরও পুষ্ট করা হইয়াছে যে কাশ্মীর উপত্যকা দেশের অন্যান্য ভূ-ভাগ হইতে কিছু স্বাতন্ত্র্য দাবি করে। সংবিধানের যে ৩৭০ ধারা কিছু সময়ের জন্য জম্মু-কাশ্মীরকে কিছু বিশেষ সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রণীত হইয়াছিল, তাহাই এখন বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজকর্মের ভিত্তি হইয়া উঠিয়াছে। যদি ইহা ভাবা যায় যে জম্মু-কাশ্মীরে কিছু বিশেষ সুবিধা প্রদান করিলে সমস্যার সমাধান হইবে—তাহাও সম্ভব নহে। বিষয়টি কিছু বিশেষ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নয়। দেশবিভাজনের সময় হইতে পাকিস্তান কাশ্মীর উপত্যকা নিজেদের বলিয়া দাবি করিয়া আসিতেছে। সেই দাবি তাহারা এখনও ছাড়ে নাই। সুযোগ পাইলেই কাশ্মীর উপত্যকায় অশান্তি সৃষ্টি করিতে উপত্যকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উসকানি দিয়া চলিতেছে। কাশ্মীরের নেতাদেরই তাই স্থানীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের একঘরে করিয়া দিতে হইবে। তখনই কাশ্মীরে শান্তির পরিবেশ অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

সুভাষিতম্

অগ্নিশেষমৃণশেষং শত্রুশেষং তথৈব চ।।
পুনঃ পুনঃ প্রবর্ধতে তস্মাচ্চ শেষং ন কারয়েৎ।।

আগুন, ঋণ ও শত্রু অল্পমাত্রা অথবা খুবই কম রেখে দিলেও তা বারবার বেড়ে যায়। সেজন্য এগুলির শেষ রাখতে নেই।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উৎখাত করতে নতুন কৌশল

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ॥ বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর হামলা, তাদের জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর, মন্দির জবরদখল, বিগ্রহ ভাঙচুর, কিশোরী-তরুণীদের অপহরণের পর ধর্মান্তরিত করে বিয়ে এবং দেশত্যাগে বাধ্য করা নতুন কিছু নয়। সাম্প্রতিক সময়ে হিন্দুদের শঙ্কা ও আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে দেশত্যাগে বাধ্য করতে নতুন কৌশল নেওয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে মন্দির বা আশ্রমের অধ্যক্ষকে হত্যা কিংবা হত্যার হুমকি, পুরোহিত- পূজারিদের হত্যা এবং পুজো বন্ধের নির্দেশ দিচ্ছে ইসলামি জঙ্গিরা অত্যন্ত সংগঠিতভাবে। শুধু জুন মাসেই অন্তত দুটি মন্দিরের পুরোহিতকে হত্যা ও কয়েকজনের ওপর হামলা, 'ইসলামি রাষ্ট্র বাংলাদেশে পুজোআচ্চা চলবে না' এই মর্মে দেশজুড়ে বিভিন্ন মঠ-মন্দিরে নির্দেশ পাঠানো এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষকে ধর্মপ্রচার বন্ধ না করলে হত্যার হুমকি হিন্দুদের শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। বিভিন্ন জেলা থেকে খবর আসছে, অনেক মন্দিরে পুজো বন্ধ হয়ে গেছে, কোথাও কোথাও ভোরে মন্দির খোলা হচ্ছে না, সন্ধ্যারতি সন্ধ্যার আগেই শেষ করে মন্দির বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। মন্দিরে পুরোহিত-পূজারিরা থাকতে সাহস পাচ্ছেন না। যাঁরা থাকছেন তাঁরা মন্দিরের ভেতর থেকে বাইরে আসতে সাহস পাচ্ছেন না।

গত জুন মাসে অন্তত দু'জন পুরোহিত-সন্ন্যাসীকে হত্যা করা হয়েছে। ৭ জুন প্রকাশ্যে দিনেরবেলায় গলা কেটে হত্যা করা হয় ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলার শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত আনন্দ গোপাল গাঙ্গুলিকে। পুজো করতে যাওয়ার পথে তাঁকে হত্যা করা হয়। ১০ জুন চাপাতি (বড় ছোরা) দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয় পাবনায় সৎসঙ্গ আশ্রমের সেবক নিত্যরঞ্জন পাণ্ডেকে। ভোরে পুজোর ফুল তোলার সময় তাঁকে হত্যা করা হয়। কয়েকমাস আগে হত্যা করা হয়েছিল পঞ্চগড়ে গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষকে, ভোরে চাপাতি দিয়ে গলা কেটে। এখন জানা যাচ্ছে, তাঁর হত্যাকারী ঢাকায় গুলশানে ১ জুলাই স্পেনিশ রেঁস্তোরা হোলি আর্টিজানে যে সাত জঙ্গি হামলা চালিয়ে ১৭ বিদেশি নাগরিক ও ৩ বাংলাদেশিকে জবাই ও গুলি করে হত্যা করে তাদের অন্যতম। পরে সেনা কমান্ডোদের অভিযানে সাত জঙ্গিই প্রাণ হারায়। এর মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন ছাড়াও চট্টগ্রাম, বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা, বরগুণা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, কক্সবাজার, ঝালকাঠি, নওগা, পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর, নোয়াখালি, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহীসহ বিভিন্ন জেলায় মন্দিরে মন্দিরে চিঠি দিয়ে পুজো বন্ধ করতে বলেছে জঙ্গিরা, পুরোহিত-সেবায়েত- পূজারিদের হত্যার হুমকি দিয়েছে। মাগুরায় কেন্দ্রীয় কালীমন্দিরে পুরোহিতের খোঁজে এসেছিল চার যুবক, না পেয়ে চলে যায়। কয়েকদিন আগে বরিশালের বিখ্যাত পাষাণময়ী কালীমাতা মন্দিরের পুরোহিতের কাছে পাঠানো এক হুমকি চিঠিতে গোটা জেলায় পুজো বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে জঙ্গিরা। বলেছে, হিন্দুরা বাঁচতে চাইলে ভারতে চলে যাও। পুরোহিত ছাড়াও হিন্দু নেতাদেরও হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে। বরিশালে এটা দ্বিতীয় দফা হুমকি। বরিশালের পরপরই ঝালককাঠিতেও দুটি মন্দিরের পুরোহিতকে হুমকি চিঠি পাঠিয়ে গোটা জেলায় পুজো বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর আগে ভোলা ও বরগুনায়ও হুমকি দেওয়া হয়েছে। হুমকিগুলো এসেছে সপ্তাখানেকের মধ্যে।

চিঠি পাঠানো হচ্ছে আই এস, আলকায়েদা, আনসারউল্লাহ বাংলা টিম, হিযবুত তাহরির ও জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশের (জেএমবি) নামে। বাংলাদেশ সরকার বরাবরই বাংলাদেশে আই এস-আল কায়েদার অস্তিত্ব অস্বীকার করে আসছে। কিন্তু নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, এই অস্বীকৃতির কোনো অর্থ নেই। কারণ আই এস এখানে আনসারউল্লাহ বাংলা টিম, হিযবুত কিংবা জেএমবির মাধ্যমে কাজ করতে পারে। লক্ষ্য, এক ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করা। প্রায় প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ড কিংবা হামলার ঘটনার পর আই এস-এর সংবাদমাধ্যম 'আমাক' দাবি করছে, এটা আই এস-এর নির্দেশে হয়েছে।

হিন্দুরা শঙ্কিত। সারাদেশে মঠ-মন্দিরে নিত্যপুজোও ব্যাহত হচ্ছে বলে খবর আসছে। কিছু মন্দিরে পুলিশ পাহারা বসানো হলেও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কাটছে না। গুলশানে একটি বিদেশি রেঁস্তোরা ও ইদের দিন কিশোরগঞ্জে শোলাকিয়ায় ইদের জামায়াতে জঙ্গি হামলার পর অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা দেশকে আরও ভয়ঙ্করভাবে গ্রাস করেছে। এই অবস্থায় হিন্দুরা আরও বেশি শঙ্কিত।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি জয়ন্ত সেন দীপু বলেছেন, সারাদেশ থেকেই উদ্বেগজনক খবর আসছে। প্রায় প্রতিদিনই মঠ-মন্দিরে হামলা ও জবরদখলের পাশাপাশি পুরোহিত-পূজারিদের যেভাবে হত্যা ও হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তাতে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। পুজোয় ব্যাঘাত ঘটছে। তিনি আরও বলেন, আমরা খুব উদ্বিগ্ন, সামনে জন্মাষ্টমী, তারপরই দুর্গাপুজো। জন্মাষ্টমীতে খোল-করতাল ও শ্রীকৃষ্ণের নানা লীলাকাহিনির দৃশ্যপট নিয়ে রাজধানীতে প্রায় লক্ষ লোকের মিছিল হয়। বর্তমান পরিস্থিতির কারণে ইসকন রথযাত্রার শোভাযাত্রা অন্যান্য বছরের মতো করতে পারেনি। অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে শোভাযাত্রা শেষ করেছে। জন্মাষ্টমীর মিছিল ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে বেরিয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর পুরনো ঢাকায় শাঁখারিবাজারের কাছে বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে শেষ হয়। এবার এটা সম্ভব হবে কিনা এখনও জানা যায়নি। তারপরেই দুর্গাপুজো, যতদূর খবর, পুরোহিত-পূজারিরা এতোই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন যে, তাঁরা পুজোয় অনীহা প্রকাশ করছেন। যদি এটা অব্যাহত থাকে পুজোয় সঙ্কট তৈরি হবে। দেশের বিভিন্ন জেলায় বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরাও প্রায় একই কথা বলেন, গ্রামবাংলায় হিন্দুদের মধ্যে প্রচণ্ড আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পুজোয় এর প্রভাব পড়বে। হিন্দু নেতৃবৃন্দ আরও জানিয়েছেন, সাম্প্রতিক পরিস্থিতি হিন্দু সমাজের মধ্যে দেশত্যাগের মানসিকতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ■

দেশদ্রোহীদের সভা ঘিরে তীব্র প্রতিবাদে সরগরম হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে হিজবুল মুজাহিদিনের কুখ্যাত খুনি কমান্ডার বুরহান মুজাফ্ফর ওয়ানির মৃত্যুর প্রতিবাদে আবার একবার হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত-বিরোধী স্লোগান উঠল। এই দেশবিরোধী কাণ্ডের পাল্টা হিসেবে এবিভিপি'র সমর্থকদের 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনিতে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর তোলপাড় হতে থাকে। পুলিশের তরফে এই সূত্রে হিংসা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণে একটি মামলাও রুজু করা হয়েছে। উভয়পক্ষই নিয়মমাফিক একে অপরের ওপর হিংসায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগ আনছে। প্রসঙ্গত, জাতিগত বৈষম্যের কারণ দেখিয়ে গবেষক ছাত্র রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় উত্তাল হয়ে ওঠার প্রায় ৬ মাস পরে ঠিক নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই আবার এই হিংসাত্মক ঘটনা ঘটল।

সংবাদে প্রকাশ, গত শনিবার পিএইচডি গবেষক মাসরুকদার ও অর্থনীতির অধ্যাপক জি বিজয়ের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কাশ্মীরি ছাত্র 'রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের প্রতিবাদে যখন আসি পাথর ছুঁড়ি' ও 'ভারতের কাশ্মীর দখল করে রাখাকে' ধিক্কার জানাতে এই সভার আয়োজন করেছিল। সভা সাঙ্গ হয়ে যাওয়ার পর ছাত্ররা 'ইনসাল্লা কাশ্মীর' নামে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শনীরও তোড়জোড় শুরু করে। এই সময় তাদের কণ্ঠে নিহত জঙ্গি ওয়ালির পক্ষে বক্তব্য ও তীব্র ভারত- বিরোধী স্লোগান শুনতে পাওয়া যায়। নিরাপত্তা-রক্ষীদের সঙ্গে মোকাবিলায় ওয়ানির মৃত্যুকে ঘিরে ইতিমধ্যেই কাশ্মীরে ব্যাপক সংঘর্ষ ও কার্ফু-র পরিস্থিতি চলছে।

এবিভিপি'র সূত্রে জানানো হয়েছে শুধু কাশ্মীর নয়, পাঞ্জাব ও সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতকে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ডাক দেওয়া সত্ত্বেও তারা সভার কাজে কোনো বাধা দেয়নি। কিন্তু এর পরেই তারা মিছিল নিয়ে 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনি দিতেই তাঁদের ওপর আক্রমণ নেমে আসে এমনটাই জানিয়েছেন বিদ্যার্থী পরিষদের এন সুশীলকুমার।

তেলুগু ভাষার স্নাতকোত্তর ছাত্র ২৩ বছরের কৈলাস খের বাঁ পায়ের হাড় ভেঙে দেওয়া হয়েছে। শ্রীকুমার আরও বলেন যে হাসপাতালে আঘাতের চিকিৎসা করাতে যাওয়ার সময়ও এই ভৈরববাহিনী হাসপাতাল চত্বরেও তাদের ওপর চড়াও হয়।

উন্নয়নের অভাবে ধুঁকছে পাক-অধিকৃত কাশ্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের অবস্থা শোচনীয়। যেসব জিহাদি ভারতের অধিকারে থাকা কাশ্মীরকে ছিনিয়ে নিয়ে জুড়তে চাইছে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের সঙ্গে স্বয়ং তারাই চিন্তিত। চিন্তার কারণ সেখানকার উন্নয়ন। বিগত কয়েক দশকে মানুষের জীবনযাত্রার মান তলানিতে এসে ঠেকেছে বলে খবর।

সম্প্রতি একটি পরিসংখ্যান থেকে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের করুণ অবস্থার কথা জানা গেছে। ১৯৪৮ সালে ভারতের শাসনাধীন জম্মু-কাশ্মীরে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যথাক্রমে ছিল ৭২২, ৫১০ এবং ৯। ২০১৫ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৪২৬৫, ২৮৪১ এবং ২৪টি। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে ১৯৪৮ সালে সংখ্যাটা ছিল ৩২৯, ২৪২ এবং ৬টি। আর ২০১৫ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩০২, ১৬১ এবং ৪টি। ১৯৪৮ সালে ভারতের এক্তিয়ারে থাকা জম্মু-কাশ্মীরে স্নাতকের হার ছিল ৩৮ শতাংশ। ২০১৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫২ শতাংশে। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সেই হার ২৩ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ৩ শতাংশ। দুটি এলাকায় মহিলাদের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও আকাশ পাতাল পার্থক্য চোখে পড়ে। ভারতের অধিকারভুক্ত কাশ্মীরে মহিলাদের ক্ষমতায়নের হার ২৪ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬১ শতাংশ। অন্যদিকে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে ১৯ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশে নেমে গেছে। ১৯৪৮ থেকে ২০১৫ এই সময়কালে জম্মু-কাশ্মীরে ১৮ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে হয়েছে মাত্র ৩০০ কিলোমিটার। পর্যটন শিল্পে ১৯৪৮ সালে ভারতের আয় ছিল ৭০ হাজার টাকা। ২০১৫ সালে তা বেড়ে হয় ১৮ লক্ষ টাকা। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে তা যথাক্রমে ২১ হাজার এবং ৪ হাজার টাকা। এই কালপর্বে ভারতের শাসনাধীন কাশ্মীরে জিডিপি বৃদ্ধির হার দ্বিগুণেরও বেশি আর দখল করা কাশ্মীরে তা ০.১৯ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ০.০৮ শতাংশ। শুধু বেকারের সংখ্যায় পাক-অধিকৃত কাশ্মীর এগিয়ে রয়েছে। ১৯৪৮ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত তিনগুণ বেকার বেড়েছে সেখানে।

কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেনি : দত্তাত্রেয় হোসবালে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ নস্যাৎ করলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে। সম্প্রতি একটি সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, কাশ্মীরের সন্ত্রাস রুখতে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা সন্তোষজনক। তিনি বলেছেন, 'আফজল গুরু, ইয়াকুব মেমনদের ফাঁসি হয়েছে তার কারণ তারা সন্ত্রাসবাদী। তাদের ফাঁসির সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সাংবিধানিক পদ্ধতিতে নেওয়া হয়েছে। কিছু মানুষ ও এক শ্রেণীর মিডিয়া সন্ত্রাসবাদীদের শহিদ বানাবার চেষ্টা করছে। এটা উচিত নয়, এভাবে নেতা হওয়া যাবে না।' এর পরেই সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্ন তোলা হয়। উত্তরে দত্তাত্রেয় হোসবালে বলেন, 'মানবাধিকার লঙ্ঘনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। দেশকে সন্ত্রাসের হাত থেকে বাঁচাতে যা করা দরকার কেন্দ্রীয় সরকার তাই করছে। আর এ ব্যাপারে কেন্দ্রের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।'

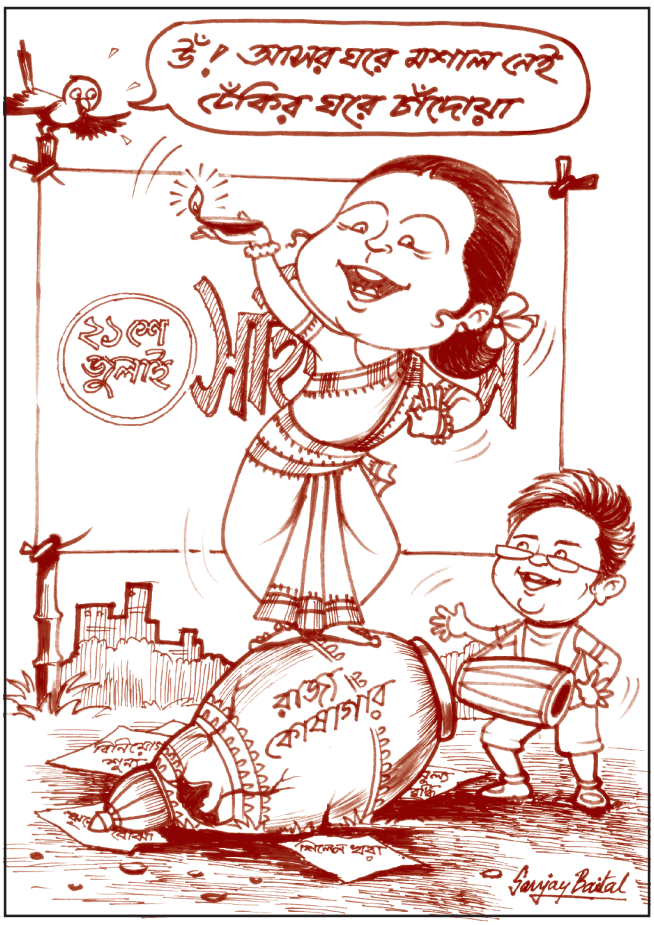

উবাচ

"বিভিন্ন দল কাশ্মীর নিয়ে যেসব বিবৃতি দিয়েছে তাতে দেশের উপকার হয়েছে। সঠিক বার্তা পৌঁছে গেছে দেশের সর্বত্র। সেজন্য, আমি প্রত্যেকটা দলকে ধন্যবাদ দিতে চাই।"

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

বুরহান ওয়ানির মৃত্যু কেন্দ্র করে কাশ্মীরে বিক্ষোভ এবং হানাহানি প্রসঙ্গে।

"আমরা (বিজেপি) বারবার বলেছি বিধানসভায় টুকি-সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। সুতরাং এই সরকারের পদত্যাগ করা উচিত। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ করেছিলেন টুকির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের বিধায়কেরা বিদ্রোহ করেছিলেন বলে।... টুকির পদত্যাগ প্রমাণ করছে বিজেপি বা রাজ্যপাল কেউই ভুল করেনি।"

শ্রীকান্ত শর্মা
বিজেপির মুখপাত্র

অরুণাচল প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নাবাম টুকির পদত্যাগ প্রসঙ্গে।

"একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্য দেওয়ার অর্থই হলো সেটি ভারতীয় সংবিধান-নির্দিষ্ট পদ্ধতি মেনে কাজ করবে। অর্থাৎ তপশিলি জাতি বা উপজাতি বিষয়ক সরকারের যে নীতি আছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে কার্যকর করবে। পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের নিয়েও কাজ করবে।"

রবিশঙ্কর প্রসাদ
কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু স্টেটাসের অবৈধতা প্রসঙ্গে।

"কাশ্মীরে যা হচ্ছে তার জন্য পাকিস্তান দায়ী। দেশটার নাম পাকিস্তান, যার অর্থ পবিত্রভূমি কিন্তু কাজকর্ম একেবারেই না-পাক (অপবিত্র)।"

রাজনাথ সিং
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

কাশ্মীরে চলতে থাকা দেশবিরোধী কার্যকলাপ প্রসঙ্গে।

পাশ ফিরে শোবেন না, বিপদ ও পাশেও

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

নিশ্চিন্তে ঘুমোবেন না। সতর্ক থাকুন। মনে রাখবেন প্রতিবেশী বিপন্ন হলে গৃহের শান্তি বিঘ্নিত হয়। গত কয়েকবছর ধরে বাংলাদেশে যা ঘটছে তার জের এসে পড়েছে ভারতের উপরেও। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে।

খাগড়াগড় কাণ্ড আগেই সতর্ক করেছিল। বোঝা গিয়েছিল, সন্ত্রাসীদের চলাচল শুরু হয়েছে এ রাজ্যেও। গুলশনের ঘটনার পরেও নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারছে না পশ্চিমবঙ্গ। আবারও এ রাজ্য থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কয়েকজনকে। মনে করা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে সরাসরি আইএসের যোগাযোগ আছে। আই এস যোগের বেশকিছু প্রমাণও মিলেছে। বস্তুত, বিষয়টি অস্বাভাবিক নয়। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী, সবসময়ই সন্ত্রাসীরা প্রতিবেশী দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিকে 'শেল্টার' হিসেবে ব্যবহার করে। এক দেশে হামলা চালিয়ে অন্য দেশে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। এবং ক্রমশ ওই প্রতিবেশী দেশেও সন্ত্রাসের আবহাওয়া ঘনীভূত হয়।

বরাবরই প্রতিবেশীর বিশৃঙ্খলায় জর্জরিত হয়েছে ভারত। রাজনীতির বিভিন্ন পর্বে জঙ্গিদের মদত দিয়েছে পাকিস্তান। যার সরাসরি প্রভাব এসে পড়েছে এদেশে। কাশ্মীরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মুম্বইয়ে ঘটে গিয়েছে ২৬/১১। শ্রীলঙ্কায় 'টাইগার' সন্ত্রাসের ফল ভুগতে হয়েছে দক্ষিণ ভারতকে। অধুনা সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। বস্তুত, যেভাবে আই এসের ভিডিওবার্তায় বাংলায় হুমকি দিচ্ছে জঙ্গিরা, যেভাবে আরও বড় হামলার প্রস্তুতির কথা জানানো হচ্ছে, তাতে আশঙ্কা আরও বাড়ছে। পার্শ্ববর্তী সিরিয়া কিংবা ইরাকে যখন হামলা চালিয়েছিল আই এস, নিশ্চুপ ছিল তুরস্ক। ভেবেছিল, 'সফট টার্গেট' ছেড়ে তুরস্কের মতো দেশে ঢুকতে পারবে না জঙ্গিরা। ভুল ভেঙেছে। বোঝা যাচ্ছে, প্রতিবেশীর অশান্তির ছায়া এবার গ্রাস করতে শুরু করেছে কামাল পাশার দেশকেও। ভারতের অবস্থা আরও সঙ্গিন। উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অশান্তি চলছিলই। এবার পূর্ব সীমান্তকেও নিরুপদ্রব ভাবা যাচ্ছে না। আশঙ্কা আরও বাড়াচ্ছেন জাকির নায়েকের মতো প্রবক্তারা। ভারতে বসে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এবং টেলিভিশনে দিনের পর দিন 'হেট স্পিচ' দেওয়া হচ্ছে। কথায় কথায় বলা হচ্ছে— 'বিশ্বের সব মুসলমানকে সন্ত্রাসবাদী হওয়ার আর্জি জানাচ্ছি'। শোনা যাচ্ছে গুলশন হামলায় জড়িত জঙ্গিদের সঙ্গেও জাকিরের যোগাযোগ ছিল। ঘটনার পর দায় এড়িয়েছেন জাকির। এখন উল্টো কথা বলছেন। কিন্তু ভারত যদি স্বঘোষিত এই সব ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ না করে, তা হলে বিপদ আরও বাড়বে।

বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম দেশ। সেখানকার সরকার নিশ্চয়ই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবে। দেশের মৌলবাদী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে! কীভাবে নেবে, তা একান্তই তাদের নিজস্ব বিষয়। একই কথা প্রযোজ্য পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও। কিন্তু বৃহত্তর ভারতকে যদি সন্ত্রাসের হাত থেকে রক্ষা করতে হয়, তাহলে সকলকে একসঙ্গে লড়তে হবে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে একটি যৌথ নীতি গ্রহণ করতে হবে। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সামাজিক স্তরে মৌলবাদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশের জঙ্গি পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে যাতে আশ্রয় না পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। পাকিস্তানের শিবিরে প্রশিক্ষণ নিয়ে কাশ্মীরে যাতে জঙ্গি কার্যকলাপ চালানো না যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। সন্ত্রাসবিরোধী ঐক্য গড়ে ওঠা আশু প্রয়োজন।

এখন কেন্দ্রের সরকারের যেমন কঠোর মনোভাব নেওয়া দরকার তেমনই দেশবাসীর পক্ষে তার জন্য অকুণ্ঠ সহযোগিতা দরকার। সমস্ত রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। আগুন পাশের বাড়িতে লেগেছে। পুড়ছে। গন্ধ পেয়েও, লেলিহান শিখা দেখেও পাশ ফিরে শোবেন না প্লিজ।

— **সুন্দর মৌলিক**

মুসলিম জেহাদি সন্ত্রাসের মোকাবিলায় রুশ-মার্কিন সামরিক চুক্তিই বিশ্ববাসীর সামনে এখন আশার আলো

বিশ্বজুড়ে এখন চরম অরাজকতা। দ্রোহকাল। আর এই অরাজকতা এবং অশান্তির কারণ একটাই— জেহাদের ডাক। তুরস্কে সাম্প্রতিক বিফল সেনা অভ্যুত্থানের পিছনেও আছে ইসলামিক স্টেটের কালোছায়া। যতদূর বোঝা যাচ্ছে যে তুরস্কের এই ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের লক্ষ্য ছিল সেখানের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়িপ এরদোগানকে ক্ষমতাচ্যুত করা। প্রেসিডেন্ট এরদোগান একজন কট্টর সুন্নি মুসলমান। এরদোগানের মদতে সিরিয়ায় অতি সক্রিয় ইসলামি স্টেট বা আই এস নিয়মিত অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য পায়। সিরিয়ায় বাশার আল আসাদ-সরকারের চরম বিরোধী এরদোগান। তবে অতি সম্প্রতি রাশিয়া ও আমেরিকার যৌথ চাপে তিনি বাধ্য হয়েছেন আই এস জঙ্গিদের দেওয়া অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করতে। তাছাড়া তুরস্কের সেনাবাহিনীও আই এস বিরোধী। কারণ, ইরাক-সিরিয়া থেকে আই এস জঙ্গিরা মাঝেমধ্যেই তুরস্কে ঢুকে সেনার উপর চোরাগোপ্তা হামলা চালাচ্ছে। ফলে বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে সেখানের সেনাবাহিনীর লোকজন। সঙ্গে বিপদ তুরস্কে ক্রমবর্ধমান ইসলামি মৌলবাদ যার নেপথ্য নায়ক এরদোগান।

তুরস্কের প্রতিবেশী দেশ সিরিয়ায় ২০১১ সালে যখন আই এস জঙ্গিরা ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু করে তখন এরদোগান এবং তার দল জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট পার্টি সিরিয়ার এই জেহাদি জঙ্গি গোষ্ঠীর পাশে দাঁড়ায়। এরদোগানের মৌলবাদী নীতির ফল ভুগতে হয় তুরস্ককে। সিরিয়ায় আই এসের হামলা থেকে প্রায় বাঁচতে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ঢুকে পড়ে সেখানে। প্রবল চাপে পড়ে যায় তুরস্কের অর্থনীতি। তাছাড়া এরদোগানের ভুল নীতির জন্য আই এস জঙ্গিরা শরণার্থীদের সঙ্গে ঢুকে পড়ে তুরস্কে যত্রতত্র চোরাগোপ্তা হামলা

গূঢ়পুরুষের কলম

চালিয়ে সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সেনাবাহিনী এইসব জঙ্গি হামলাকে ভাল চোখে দেখেনি। যদিও আন্তর্জাতিক চাপে এরদোগানের তুরস্ক আই এস দমনে মার্কিন শিবিরে যুক্ত। এই দুমুখো নীতিকে আমেরিকা বা রাশিয়া কেউই পছন্দ করেনি। একদা রাশিয়ার দেওয়া অর্থ সাহায্যেই তুরস্কের আর্থিক হাল ফিরিয়ে ছিলেন এরদোগান। একমাত্র এই একটি কারণে তিনি আজ তুরস্কে এতটা জনপ্রিয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আই এসকে সমর্থন এবং সিরিয়ায় রুশপন্থী আসাদ সরকারের বিরোধিতা করার জন্য তুরস্কের অর্থিনীতি বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে। রাশিয়া তুরস্কের এরদোগান সরকারকে এতকাল ধরে দেওয়া খয়রাতি অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে। যে অর্থনীতির উন্নতির জন্য গত দশ বছর এরদোগান এতটা জনপ্রিয় সেই অর্থনীতিতে এখন চওড়া ফাটল ধরেছে। আই এস জঙ্গিদের সমর্থন করতে গিয়ে তিনি এখন পাঁকে পড়েছেন।

একটাই আশার আলো দেখা যাচ্ছে। মৌলবাদী মুসলমান জঙ্গি সংগঠনগুলিকে খতম করতে ইউরোপের সমস্ত দেশ, আমেরিকা এবং রাশিয়া পারস্পরিক সহযোগিতায় রাজি হয়েছে। ইতিমধ্যেই মার্কিন বিদেশ সচিব জন কেরি মস্কোতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তাঁদের বৈঠকের উদ্দেশ্য, সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেট ও আল নুসরা ফ্রন্টকে নিশ্চিহ্ন করতে দুই দেশের জয়েন্ট ইমপ্লিকেন্টেশন গ্রুপ বা জে আই পি গঠন করা। এই গ্রুপ তৈরি হলে আমেরিকা ও রাশিয়ার সেনা সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে একসঙ্গে লড়বে। আই এস এবং আল নুসরা ফ্রন্ট এই দুই জঙ্গি সংগঠনকেই রাষ্ট্রপুঞ্জ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বলে ঘোষণা করেছে। তবে এই জঙ্গি সংগঠনের লক্ষ্য কিছুটা আলাদা। ইসলামিক স্টেটের স্বপ্ন, বিশ্বজুড়ে খলিফাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

অন্যদিকে, আল নুসরা ফ্রন্টের লক্ষ্য সিরিয়ায় বাশার আল আসাদকে ধ্বংস করা। মুসলিম জেহাদি সন্ত্রাসের মোকাবিলায় রুশ-মার্কিন সামরিক চুক্তিই বিশ্ববাসীর সামনে এখন আশার আলো। কারণ, শুধুমাত্র আকাশপথে বিমানহানায় যে কাজের কাজ কিছু হবে না সে' কথা এখন দিনের আলোর মতোই সত্য। আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে জার্মানির একনায়ক নাৎসি নেতা এডলফ হিটলারের নৃশংসতার প্রতিরোধে কমিউনিস্ট সোভিয়েত রাশিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছিল পুঁজিবাদী আমেরিকা। বিশ্ববাসী রক্ষা পেয়েছিল নাৎসি বর্বরতার হাত থেকে। আবার সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় কীনা তা দেখার অপেক্ষায় থাকবো। ■

সি পি আই (এম)-এর রাজনীতি

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সকলেই এটা এখন মেনে নিয়েছেন যে, সিপিআই (এম) দল এবার একটা গভীর সঙ্কটে পড়েছে। কেন্দ্রীয় স্তরে কখনই এই দল তেমন কিছু করতে পারেনি, তিনটে অঙ্গরাজ্যেই শুধু তার কিছুটা প্রভাব ছিল। কিন্তু এখন তার অস্তিত্বই প্রায় বিপন্ন। কেরলে ও ত্রিপুরায় তাদের শাসন চলছে বটে, কিন্তু অন্যত্র এই দল এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সাম্প্রতিক নির্বাচনে তামিলনাড়ুতে তাদের একটা আসনও জোটেনি, যদিও আগের নির্বাচনে তাদের ১০টা আসন ছিল।

১৯২৪ সালে মার্কসীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতের কমিউনিস্ট দলের (সিপিআই) উদ্ভব ঘটেছিল। মার্কসের তত্ত্বাদর্শ গ্রহণ করায় তাদের কর্মসূচিতে অহিংসা, সংসদীয় পদ্ধতি, নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ের স্থান ছিল না— শ্রমিক আন্দোলন, বিপ্লব, শ্রেণীসংগ্রাম প্রভৃতিতেই এই দল প্রাধান্য দিয়েছিল।

১৯৪৭ সালের দেশের স্বাধীনতাকে এই দল 'ঝুটা' বলে চিহ্নিত করেছে এবং পরের বছর গ্রহণ করেছে স্থানীয় বিপ্লবের হঠকারী কর্মসূচি। বিশেষ করে, তেলেঙ্গানা ও কাকদ্বীপে এই দল রক্তাক্তপথ নিয়েছিল। তেলেঙ্গানায় গেরিলা বাহিনী তৈরি করে নেতা ও কর্মীরা বিপ্লবাত্মক ক্রিয়াকর্ম চালিয়েছিল। তাতে অন্তত ২ হাজার মানুষের প্রাণ গেছে, ২০টি থানা আক্রান্ত হয়েছে, ২৩০টি বন্দুক লুণ্ঠিত হয়েছে— সংগ্রহ করা হয়েছিল ১০ লক্ষ টাকা। (ভারতে কমিউনিজম, লেখক— অমলেন্দু ঘোষ, পৃ. ১৭৬)।

কিন্তু তারপর ক্রমে এই দল বুঝেছে যে, পথটা ভ্রান্ত। নেতৃত্বের বদল হয়েছে, গৃহীত হয়েছে সংসদীয় পথ। প্রথম নির্বাচনে (১৯৫২) তাদের আদৌ সুবিধে না হলেও দ্বিতীয় নির্বাচনে কেরলে সিপিআই (অবিভক্ত) গরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠন করেছে। তখন থেকে নেতারা বুঝেছেন যে, জন-সান্নিধ্যে থাকলে সফল হওয়া যাবে, ক্ষমতা হাতে আসবে। তাই গৃহীত হয়েছে 'কেরলের পথ', 'তেলেঙ্গানার পথ' নয়, সশস্ত্র সংগ্রাম নয়।

কিন্তু সেই সরকার বেশিদিন টেকেনি। অন্যান্য রাজ্যেও এই দলের তেমন সাফল্য আসেনি। ১৯৬৪ সালে রুশ-চীন মত-দ্বন্দ্বের ফলে এই দলে বিরাট ভাঙন দেখা দিয়েছে, সিপিআই (এম) দলের উদ্ভব ঘটেছে। সিপিআই কিছু কিছু রাজ্যে অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারলেও মার্কসবাদী অংশটা কেরল, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। ত্রিপুরা অবশ্য ছোট রাজ্য— ভারতীয় রাজনীতিতে তার ভূমিকা নগণ্য। বলা হয়েছে— পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলেই সিপিআই (এম) 'মেজর পার্টি'। কেরলে এই দল কয়েকবার কোয়ালিশান সরকার গড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্টের শরিক হয়ে ক্ষমতায় ভাগ বসিয়েছে।

অবশ্য আরও দশ বছর পরে (১৯৭৭) এই দল বামফ্রন্টের নেতৃত্ব দখল করে ক্ষমতায় বসেছিল— সেই সরকার পরপর বিপুল নির্বাচনী সাফল্য পেয়ে প্রভুত্ব বজায় রেখেছিল ২০১১ সালের নির্বাচন পর্যন্ত। সেই কারণে ড. বি সি রাউত ১৯৭৯ সালে মন্তব্য করেছিলেন, 'Today, the CPI (M) is a powerful party in West Bengal'। বলা বাহুল্য, একটানা চৌতিরিশ বছর ধরে বিরাট গরিষ্ঠতা বজায় রাখাটা একটা শ্লাঘার বিষয়। দলের মুখ্যমন্ত্রী সদম্ভে বলেছিলেন, 'আমাদের ২৩০, ওদের ৩০।'

কিন্তু ২০১১-র নির্বাচনে সব ওলোট-পালট হয়ে গেছে— ভেঙে পড়েছে সিপিআই (এম)-এর তাসের ঘর। ২৯৪টি আসন-বিশিষ্ট বিধানসভার ১৭৮টি আসনে তৃণমূল জয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছিল। দীর্ঘকালের বামযুগের অবসান ঘটেছিল এমন করেই। এবার (২০১৬-র নির্বাচনে) সিপিআই (এম) তার তিন সঙ্গীকে (সিপিআই, ফরোওয়ার্ড ব্লক ও আর এস পি) নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গেও হাত মিলিয়েছিল। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি— কংগ্রেস পেয়েছে ৪৪টি আসন, বামফ্রন্ট ৩২টি— জোট ৭৬টি আসন। তৃণমূল কিন্তু তার আসন-সদস্য বাড়িয়ে নিয়েছে— এবার ২১১। সিপিআই (এম) এবার পেয়েছে প্রদত্ত ভোটের ১৯.৭ শতাংশ, সিপিআই ১.৪ শতাংশ, ফরোওয়ার্ড ব্লক ২.৮ শতাংশ এবং আর এস পি ১.৭ শতাংশ। সিপিআই (এম)-এর আসন-সংখ্যা মাত্র ২৬, সিপিআই ১, ফরোওয়ার্ড ব্লক-২ এবং আর এস পি-৩। কংগ্রেসের সঙ্গে জোট গঠন করেও মোট আসন তাদের হয়েছে ৭৬টি।

এতেই বোঝা যায় যে, কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট এখন এই রাজ্যে একটা ক্ষয়িষ্ণু শক্তিমাত্র। চৌতিরিশ বছরের একাধিপত্যের পর বামফ্রন্টের এই ভগ্নদশা কেন হলো, সেটা সহজেই অনুমেয়। আর ১৩০ বছরের পুরনো কংগ্রেসের (জন্ম ১৮৮৫ সাল) পক্ষে এটা একটা কলঙ্কময় লজ্জাজনক ব্যাপার।

অবশ্যই কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দলের এই জোটবন্ধন একটা অভাবনীয় বিষয়। কমিউনিস্ট দলের আবির্ভাবের পর এই দুই

'জাতীয় দল' হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে একটা দলকে ৩টি রাজ্য থেকে অন্তত ১১ জন সাংসদ বা ৪টি রাজ্য থেকে ৬ শতাংশ ভোট পেতে হবে এবং লোকসভায় ৪ জন সাংসদ থাকতে হবে। সিপিআই (এম)-এর লোকসভা সদস্য এখন মাত্র ৯ জন এবং ৩টি রাজ্যে ভোটসংখ্যা ৩.২৫ শতাংশ। তার ফলে এই দল সর্ব-ভারতীয় স্বীকৃতিও হারাতে পারে এবার।

দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ ঘটেছে, আবার কোনো কোনো সময় তারা কিছুটা সমঝোতাও করেছে— কিন্তু নির্বাচনী জোট আগে হয়নি। দুই ক্ষয়িষ্ণু পক্ষ এবার হাত মিলিয়েছিল আত্মরক্ষার জন্য— কিন্তু সেই প্রয়াসও ব্যর্থ হয়েছে।

এটা লক্ষণীয় যে, ১৯৩০ সালে এই দেশের কমিউনিস্ট দলের কাছে রাশিয়ার 'কমিন্টার্ন'-এর কাছ থেকে চিঠি এসেছিল— কংগ্রেস বিপ্লব-বিরোধী শক্তি— 'It has long ago betrayed the Indian people and cannot lead the strugle'। সুতরাং তার বিরুদ্ধাচরণ করতেই হবে— 'Sever your contact with National Congress'। অথচ ১৯৩৩ সালে জার্মানিতে হিট্‌লারের অপসারণের পর সোভিয়েত রাশিয়া ভয় পেয়ে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট দলকে জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করার পরামর্শ দিয়েছে। সেই নির্দেশ ও 'দত্ত-ব্র্যড্‌লে থিসিস' অনুসারে এখানে কমিউনিস্ট দল 'কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল'-এর (সিএসপি) মাধ্যমে কংগ্রেসে ঢুকেছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সিএসপি-র সঙ্গে বিরোধ বাঁধায় তাদের সরে যেতে হয়েছে।

স্বাধীনতার পর কমিউনিস্ট নেতারা নিজেদের কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন। ১৯৬৩ সালেও বলা হলো— কংগ্রেস জাতীয় বুর্জোয়াদের দল। কিন্তু অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দলের সঙ্গে তাকে একই পর্যায়ে ফেলা হয়নি, কারণ কংগ্রেস কিছু 'প্রগতিশীল' নীতি (যেমন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থা, রাশিয়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক, ধর্মনিরপেক্ষতা) গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীর রুশ-প্রীতি তাঁদের ভাল লেগেছিল। দল ভাঙার পর সিপিআই কংগ্রেসের অনেক কাছাকাছি এসেছে— ড. জে সি জোহারী এটাকে 'invisible alliance' আখ্যা দিয়েছেন। দলের নেতা এস.এ. ডাঙ্গে শেষ দিন পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে গেছেন। তিনি চীনের ভারত আক্রমণেরও নিন্দা করেছেন। চীনের দিকে ঝোঁক থাকায় সিপিআই (এম) কিন্তু ছিল একটু দূরে। তবে ১৯৬৯ সালে 'ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস' ভাঙার পর সংসদে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ায় (মাত্র ২৪০টি আসন) আকালি দল, সমাজতন্ত্রী দল ইত্যাদির মতো দুই কমিউনিস্ট দলই তাঁর সরকারকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

তবে মোহিত সেন মন্তব্য করেছেন, ১৯৭৭ সালে তারা দূরে সরেছে— 'The only concern of the CPI (M) and CPI was however, to keep Indira Gandhi out of power।' সেই জন্য তারা জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, 'জনতা দল'-কে সমর্থন করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছে। সিপিআই (এম) কংগ্রেস-নেতা মনমোহন সিং-য়ের প্রথম ক্যাবিনেটকে সমর্থন জানিয়েছিল --- পরে অবশ্য পারমাণবিক নীতির সমালোচনা করে আবার দূরে সরে গেছে।

এই মিলন-বিরহের খেলা চলছে কয়েক যুগ ধরে।

কিন্তু এটা ঐতিহাসিক সত্যি যে, কংগ্রেস ও সিপিআই (এম)-এর মধ্যে আগে কখনও নির্বাচনী সমঝোতা হয়নি। আসলে, নির্বাচনী আঁতাত হয়ে থাকে সমভাবাপন্ন দলের মধ্যে। কিন্তু সিপিআই (এম) এই ব্যাপারে কোনো নীতি বা আদর্শ মানেনি— যখন যেখানে সুবিধে হয়েছে, সেই রকম আঁতাত করেছে। আগে এই দল কেরলে মুসলিম লীগ, কংগ্রেস (৬৯), মনি-কংগ্রেসের সঙ্গেও আঁতাত করেছিল। পশ্চিমবঙ্গেও সেই রকম হয়েছে। ড. এম. এল. সিক্রি মন্তব্য করেছেন, 'even the CPI (M) in West Bengal has diluted its communist identity to stay in power।' তাঁর মতে, এই দলের নেতারা নীতিহীন সুবিধাবাদী— 'unprincipled opportunists। অনুরূপভাবে ড. হরিহর দাসও মন্তব্য করেছেন, এই দলের আদৌ 'definite principle' নেই— নেতারা স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের নীতি গ্রহণ করেছেন। দুই পক্ষের কিছু নেতা অবশ্য আশা করেছিলেন যে, আঁতাত হলে তাঁদের মিলিত ভোটসংখ্যা অনেক বাড়বে, হঠানো যাবে তৃণমূলকে। কিন্তু ভোটের ফল তাঁদের সব আশা চূর্ণ করেছে।

অবশ্যই সিপিআই (এম) দলের বহু নেতা ও কর্মী দলের এই জোট নীতিকে মেনে নিতে পারেননি, প্রতিবাদে তাঁরা দল ছেড়েছেন। কেরলে ও ত্রিপুরার অনেক নেতাও এর তীব্র সমালোচনা করেছেন। এমনকী, দলের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এটি নিয়ে তীক্ষ্ণ ও শ্লেষাত্মক মন্তব্যও করেছেন। দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ৯০ জন সদস্যের মধ্যে ৬০ জনই এই ব্যাপারে তাঁদের ক্ষোভ জানিয়েছেন। তবে এটাও লক্ষণীয় যে, তাঁরা মনে করেন বর্তমান পরিস্থিতিতে এটা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। এক কথায় বলা যায়, পুরো দলটাই এখন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তি-অসহায়তাবোধে ভুগছে। তার ওপর দলের ফ্রন্ট-সঙ্গী তিনটে দলও এই ব্যাপারে ভীষণ ক্রুদ্ধ। তাদের বক্তব্য হলো, সিপিআই (এম) এই ব্যাপারে একতরফাভাবে হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আরও লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, দলের অনেকে এস ইউ সি, লিবারেশন ইত্যাদিকে নিয়ে ফ্রন্টকে প্রসারিত করতে চান। কিন্তু কংগ্রেসকে সঙ্গে রাখলে তারা ফ্রন্টে যাবে না।

এই সব কারণে বলা যায়, সিপিআই (এম) এখন একটা দারুণ সঙ্কটে পড়েছে। এবার এই রাজ্যে ১ কোটি ১৫ লক্ষ মানুষ ভোট দেননি, আর ৮ লক্ষ ৩১ হাজার মানুষ ভোট দিয়েছেন 'নোটা'-য়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই মনে হয় এই দলের বিক্ষুব্ধ সমর্থক।

দলের বিপ্লবাত্মক 'তেলেঙ্গানা লাইন' অনেক আগেই পরিত্যক্ত হয়েছিল, নির্বাচনী পথও সফল হয়নি। ডব্লুউ এইচ মরিস জোন্স মন্তব্য করেছেন, 'The communist gains have been very limited and very patchy।' এবার দেখা দিয়েছে তাদের অস্তিত্বের সঙ্কট। 'জাতীয় দল' হিসেবে স্বীকৃতি পেতে হলে একটা দলকে ৩টি রাজ্য থেকে অন্তত ১১ জন সাংসদ বা ৪টি রাজ্য থেকে ৬ শতাংশ ভোট পেতে হবে এবং লোকসভায় ৪ জন সাংসদ থাকতে হবে। সিপিআই (এম)-এর লোকসভা সদস্য এখন মাত্র ৯ জন এবং ৩টি রাজ্যে ভোটসংখ্যা ৩.২৫ শতাংশ। তার ফলে এই দল সর্ব-ভারতীয় স্বীকৃতিও হারাতে পারে এবার।

লোকমান্য তিলকের গীতারহস্যে জাতীয়তা

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

জ্ঞানকর্মযোগী বালগঙ্গাধর তিলক প্রণীত 'গীতারহস্য' গ্রন্থের শতবর্ষ পূর্ণ হলো। এই অনন্যসাধারণ গ্রন্থটি সম্পর্কে আমরা বাঙালিরা খুব বেশি কিছু জানি না। অথচ লোকমান্য তিলকের সনির্বন্ধ অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মূল মারাঠি থেকে বাংলায় এটি অনুবাদ করেন।

১৯০৫-এ বঙ্গবঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলে বিভক্ত হয়ে গেলে তিলক চরমপন্থীদের নেতৃত্ব দান করেন। তিনি কেশরী পত্রিকায় বিপ্লববাদের সমর্থনে যেসব জ্বালাময়ী রচনা প্রকাশ করেন তার ফলে তিনি ছ' বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে মান্দালয় জেলে প্রেরিত হন। এই জেলে বসে তিনি 'গীতারহস্য' রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় কংসের কারাগারে আর গীতারহস্যের জন্ম হয় ইংরেজের কারাগারে। উভয়ের জন্ম অত্যাচার থেকে মানব সমাজকে মুক্তি দেবার জন্য। ১৯০৮-১৯১৪ চৈত্র মাসের মধ্যে তিনি গীতারহস্য রচনা করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এটি প্রকাশিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে। এই অনুবাদ তিলক দেখে যেতে পারেননি। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

ঊনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতের দু' প্রান্তে এমন দু'জন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল যাঁরা ব্রাহ্মণ্যতেজে দীপ্ত হয়েও ক্ষাত্রবীর্যে অপরাজেয় ছিলেন। এঁদের একজন বাঙালি— ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অপরজন মহারাষ্ট্রীয় লোকমান্য তিলক। একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, অন্যজন কর্মযোগী গৃহস্থ। অথচ উভয়েই ভারতকে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য এবং পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জীবনে মহত্তম দুঃখকে বরণ করেছিলেন। লোকমান্য তিলকের অশেষ গুণরাজির মধ্যে অন্যতম গুণ হলো, তিনি ছিলেন 'Born Leader.' বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলা তথা ভারতবর্ষে যখন স্বদেশ প্রেম ও স্বাজাত্যবোধের প্রবল বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল তখন ভারতবাসী যে তিনটি নাম একত্রে স্মরণ করত, সেই 'লাল-বাল-পাল'-এর অন্যতম হলেন লোকমান্য তিলক। এই ত্রয়ী সে যুগে সমগ্র জাতিকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষাদান করেছিলেন, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব স্বাধীনতা আন্দোলনে পড়েছিল।

মহারাষ্ট্রের চিৎপাবন (যাঁহার স্মরণে মননে চিত্ত পবিত্র হয়) ব্রাহ্মণবংশে বালগঙ্গাধর তিলক ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৩ জুলাই রত্নগিরি নামক স্থানে ভূমিষ্ঠ হন। বাল্যকাল থেকেই তিলক ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তাঁর শিক্ষালাভ পুনার বিদ্যালয় ও ডেকান মহাবিদ্যালয়ে হয়েছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বি.এ. পাশ করে আইন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে আইন পাশ করেন। দেশের জনগণকে রাজনৈতিক চেতনায় ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি 'নিউ ইংলিশ স্কুল' স্থাপন এবং মারাঠি ভাষায় 'কেশরী' ও ইংরেজি ভাষায় 'মারহাট্টা' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিলক শুধু মেধাবী ছিলেন না, ছিলেন বিদগ্ধ ও বহুশ্রুত ব্যক্তি। গণিত, ইতিহাস, সংস্কৃত ও প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ফার্গুসন কলেজে তিনি কিছুকাল গণিত ও সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যশস্বী (ছাত্রসংসদি লব্ধকীর্তিঃ) হয়েছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে দেশবাসীর অন্তরে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির জন্য শিবাজী-উৎসব প্রচলন করেন। তিনি শ্রী অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিশ্বাস করতেন, কংগ্রেসকে আবেদন-নিবেদনের পথ পরিহার করে জনগণকে জাতীয়তাবোধে

উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন--- 'স্বরাজ মানুষের জন্মগত অধিকার'। তিনি ১ আগস্ট, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ও উদগ্র স্বদেশপ্রেমের মূর্তরূপ ছিলেন। বেদ সম্পর্কে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি আজও বিশ্বের বিস্ময় স্বরূপ। কিন্তু তাঁর অক্ষয় কীর্তি হলো মারাঠি ভাষায় রচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভিনব ভাষ্য এই 'গীতারহস্য বা কর্মযোগশাস্ত্র'। তিনি নির্জন কারাকক্ষে বসে যখন এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তখন তাঁর হাতের কাছে স্মৃতিসাহায্যকারী কোনো গ্রন্থ ছিল না। তিনি এর সমস্ত উপকরণ স্বকীয় স্মৃতিভাণ্ডার থেকে গ্রহণ করেছিলেন। ধন্য তাঁর স্মৃতিশক্তি! ধন্য তাঁর প্রতিভা! 'গীতারহস্য' চিরদিন বিদ্বানদের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করবে। মনস্বী সাহিত্যসাধক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় এর অনুবাদ করে আবহমানকালের বাঙালি বিদ্বানদের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন, এতে সংশয় নেই।

লোকমান্য তিলকের 'গীতারহস্য' শুধু এক অনন্য সাধারণ গ্রন্থ নয়, এ হলো 'বিশ্বের বিস্ময়' স্বরূপ। কারণ, এই গ্রন্থে ধর্মাধর্ম নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শাস্ত্রসমূহ মন্থন করে তিনি গীতার কর্মযোগের যে অসাধারণ ব্যাখ্যা করেছেন, তা যেমন চমকপ্রদ তেমন অভূতপূর্ব। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, বিচার নৈপুণ্য, ও পাণ্ডিত্যের পরিধি আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে।

এখন প্রশ্ন, আবহমানকাল ধরে গীতার বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকাভাষ্য রচিত হয়ে এলেও তিলক কেন এর ভাষ্য রচনা করতে গেলেন? তার কারণ, গীতার সমস্ত ভাষ্য নিবৃত্তিপর মোক্ষধর্মকে মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় করে দেখিয়েছে। প্রবৃত্তিপর কর্মযোগকে গৌণ করে তুলেছে। বিষয়টি একটু বিস্তারিত করা যাক। গীতার বহু টীকাভাষ্য শঙ্করাচার্যের পূর্বে প্রচলিত ছিল, যেগুলির প্রতিপাদ্য ছিল প্রবৃত্তিপর কর্মযোগ। অর্থাৎ এই ভাষ্যকারগণ প্রতিপন্ন করেছিলেন যে একই পুরুষের দ্বারা একই সময়ে জ্ঞান ও কর্ম অনুষ্ঠান করা অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই সকল ভাষ্য কালের করালগ্রাসে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে। তা হলে আমরা এর সন্ধান কীভাবে পেলাম? তার উত্তরে বলা যায় যে, সেইসব প্রাচীন ও অধুনালুপ্ত ভাষ্যগুলির সিদ্ধান্ত দূরীকরণের জন্য শঙ্কররাচার্য তাঁর ভাষ্য রচনা করছেন বলে ভাষ্য ভূমিকায় উল্লেখ করেন। তিনি বলেন— ''তস্যাস্য গীতাশাস্ত্রস্য সংক্ষেপতঃ প্রয়োজনং পরং নিঃশ্রেয়সং সহেতুকস্য সংসারস্য অত্যন্তোপরমলক্ষণং, তচ্চ সর্বকর্ম সন্ন্যাস পূর্বকাৎ আত্মজ্ঞান নিষ্ঠারূপাৎ ধর্মাৎভবতি।'' নিবৃত্তি লক্ষণ পরম নিরশ্রেয়স। তাও আবার সর্বকর্মসন্ন্যাসপূর্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা রূপ ধর্ম থেকে জাত। আচার্যের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর গীতাভাষ্য রচনার পূর্বে যে সকল গীতাভাষ্য রচিত হয়েছিল সেই সকল ভাষ্যে কেবল নিবৃত্তিপর মোক্ষধর্মকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি; প্রবৃত্তিপর কর্মযোগেরও প্রাধান্য ছিল। যদি তা না থাকত তবে আচার্য শঙ্কর উপরিউক্ত মন্তব্য করতেন না।

তিলক শাস্ত্রীয় বিচার পদ্ধতি অবলম্বন করেই আচার্য শঙ্করের উক্ত অভিমত খণ্ডন করেন। তাঁর মতে, গীতা যদি সন্ন্যাস-ধর্মকে প্রাধান্য দিত তবে অর্জুনের বৈরাগ্য দেখে শ্রীকৃষ্ণ তাকে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের উপদেশ দিতেন; যুদ্ধ করার উপদেশ দিতেন না। গীতার উপসংহারে দেখা যায় (১৮/৫৭-৬২) শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, অহঙ্কারবশত যুদ্ধ না করার কথা বললেও প্রকৃতি অর্জুনকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে। কারণ অর্জুন তখনও প্রকৃতির অধীন। তাই সকল কর্ম মনের দ্বারা সর্বান্তকরণে ঈশ্বরে সমর্পণ করে কর্ম করাই শ্রেয়। শ্রীভগবানের এই উপদেশেই অর্জুনের সব সংশয় দূর হয়। তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হন। সমগ্র গীতায় বারংবার সেই যুদ্ধের কথা অর্থাৎ কর্মানুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। গীতা যে মূলত প্রকৃতিপর কর্মপ্রধান শাস্ত্র তা প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি এর নাম দেন 'কর্মযোগশাস্ত্র'। তাঁর মতে, ব্যাবহারিক ধর্মের মূলতত্ত্ব গীতায় নির্ণীত হয়েছে। একমাত্র গীতাতেই বেদান্তের গভীর তত্ত্বজ্ঞানের ভিত্তিতে কর্মাকর্ম নির্ণয় করা হয়েছে। এক কথায় গীতাই হিন্দুর নীতিশাস্ত্র বা Ethices। তিলক তাই গীতারহস্যের ইংরেজি নাম দিয়েছেন— 'The Hindu Philosophy of Life, Ethices and Religion।'

তিলকের মতে গীতার কর্মযোগ-প্রধান বিচার এই প্রথম। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রচেষ্টাকে বাদ দিলে তিলকের কথা সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিককালের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের নিকট গীতার তাৎপর্যার্থ বুঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ তিনি মনে করতেন হিন্দুধর্মের সংস্কার দ্বারা তার পুনরুজ্জীবন ব্যতীত ভারতবর্ষের উন্নতি নেই। ধর্ম বলতে তিনি বুঝেছিলেন, In theory a philosophy of life, in practice a rule of life। অর্থাৎ সেই Ethics। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন সংস্কারের দ্বারা উজ্জীবিত হিন্দুধর্ম, যা সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তার সম্পূর্ণ প্রকৃতি গীতায় পরিস্ফুট হয়েছে। গীতারহস্যের ভূমিকায় তিলক অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন--- 'সংক্ষেপে কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধরূপে আধুনিক হিন্দুধর্মের তত্ত্ব বুঝাবার জন্য গীতার তুল্য দ্বিতীয় গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে নেই।' গীতায় জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সমন্বয় রয়েছে বলেই বঙ্কিমচন্দ্র একে শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বলেছেন। গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শকেই তিনি 'দেবী চৌধুরাণী'তে দেখালেন অধঃপতিত জাতির পুনরভ্যুত্থানের আশায়। গীতার টীকায় তিনি লিখেছেন— 'কর্মযোগীর কর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য সর্বভূতে হিতসাধন; সর্বভূতে সমদৃষ্টি, সর্বভূতে আত্মজ্ঞান ও সর্বভূতে হিতসাধন।' তিলকের মতেও সর্বভূতে সমদৃষ্টি রেখে সর্বভূতের হিতসাধন মানবনীতির চরম উৎকর্ষতার পরম প্রকাশ। এই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়।

অন্তত বঙ্কিমচন্দ্র ও তিলক গীতার মধ্যে যে কর্মযোগশাস্ত্র খুঁজে পেয়েছিলেন তার একটি ঐতিহাসিক পটভূমি ছিল। বৈদিকধর্ম মুখ্যত যাগযজ্ঞমূলক; যার লক্ষ্য ইহলোকে ভোগৈশ্বর্য ও পরলোকে স্বর্গলাভ। মানুষের অধ্যাত্মক্ষুধা এই কাম্যফলপ্রদ ধর্মে তৃপ্ত হয়নি। উপনিষদের ঋষিরা তখন মানুষকে এক নতুন পথের সন্ধান দিলেন। তা হলো আত্মজ্ঞান লাভ করে পরামৃত্যুর অতীত হওয়া এবং অমৃতত্ব লাভ করা। উপনিষদ বা বেদান্তের এই মূল তত্ত্বটি 'জ্ঞানমার্গ' নামে পরিচিত। বেদান্ত-সাংখ্য-বৌদ্ধ সকলেই এই

জ্ঞানমার্গের পথিক হয়ে পড়লেন। কর্মকে গৌণ করে মোক্ষকে মুখ্য করল।

কিন্তু কর্মত্যাগ করে ব্রহ্ম-কৈবল্য-নির্বাণ লাভই মানুষের একমাত্র সাধ্য হয়ে উঠলে সমাজরক্ষা হবে কীভাবে? তখন মনু প্রমুখ স্মৃতিশাস্ত্রকার ঋষিগণ চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমকে আশ্রয় করে লোকসংগ্রহ করতে চেষ্টা করলেন। মনু পরিষ্কার বললেন— 'গার্হস্থ্য ধর্মই শ্রেষ্ঠ', কারণ অন্য তিন আশ্রম এর উপর নির্ভরশীল।' মনু প্রবৃত্তিপর ও নিবৃত্তিপর উভয় কর্মের কথা বলেছেন। তাঁর মতে ঐহিক-পারলৌকিক ও কাম্যকর্মসমূহ প্রবৃত্তিপর এবং জ্ঞানপূর্বক অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম নিবৃত্তিপর। তা সত্ত্বেও জ্ঞানকর্ম সমুচ্চয়ের এই স্মার্ত প্রচেষ্টা খুব সফল হয়নি। গীতাকার এই ধর্মসঙ্কট অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, এক অনির্দেশ্য, অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। মানুষ চায় এমন এক ঈশ্বর যার সঙ্গে 'তুমি-আমি' সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। এই কারণেই গীতার ন্যায় একটি গ্রন্থের প্রয়োজন সৃষ্ট হয়। কারণ গীতাতেই আমরা সর্বপ্রথম এমন একজন ঈশ্বরের সন্ধান পাই, যিনি বিশ্বগত হয়েও বিশ্বাতীত। এই ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান। তাঁর নিকট উচ্চ-নীচ ভেদ নেই; স্ত্রী-পুত্র ভেদ নেই। যাঁকে সমস্ত কর্মফল সমর্পণ করে আমরা কর্মবন্ধন হতে মুক্তিলাভ করি। জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির এই মিলিত রূপই গীতার ধর্ম যা সহজেই সার্বজনীন হয়ে ওঠে। এই জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের ভিত্তিতেই গীতার কর্মযোগ 'নৈতিক' হয়ে উঠেছে। সর্বভূতে সমবস্থিত যে ঈশ্বর, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিরাসক্ত চিত্তে সর্বভূতের হিতসাধনই গীতোক্ত কর্মযোগের আদর্শ। কিন্তু পরবর্তীকালে জ্ঞান ও ভক্তির এই সমন্বয় রক্ষিত হয়নি। ধর্ম ক্রমশ ভক্তি-প্রধান হতে হতে তমোগুণ-প্রধান হয়ে উঠলো। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী ভারতবর্ষের ইতিহাসে তমসাবৃত যুগ। হিন্দুসমাজ তখন তমোগুণের তমসায় আচ্ছন্ন। বিচারহীন আচারসর্বস্ব স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এই সার্বিক অধঃপতনের মূলে ছিল রাজনৈতিক পরাধীনতা। মুসলমান বিজয়ের পর থেকেই হিন্দুর ক্ষাত্রবীর্য লুপ্ত হতে শুরু করে। ফলে রজোগুণের বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। ফলে তামসিকতাই এক ধরনের সাত্ত্বিকতার লক্ষণ বলে বিবেচিত হতে লাগল।

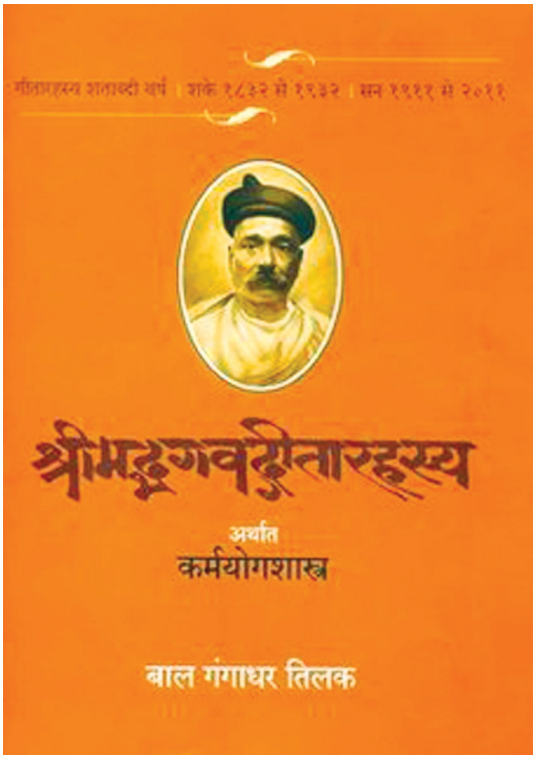

গীতারহস্যে লোকমান্য তিলক যে কর্মযোগের কথা বলেছেন তা সর্বকালীন। কোনোদিন তার প্রয়োজন নিঃশেষ হবে না। কারণ, মানুষ যতদিন এই জগতে থাকবে ততদিন তাকে কর্ম করতে হবে। কর্ম করাই তার প্রকৃতি। ....যতদিন না মানুষ সম্পূর্ণভাবে লোকহিতায় কর্ম করতে অভ্যস্ত হবে ততদিন পর্যন্ত গীতারহস্যের প্রয়োজনীয়তা থাকবে।

এই অধঃপতিত তামসিক সুপ্তি থেকে ভারতবর্ষের নবজাগরণ ঘটল ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাতে। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিক ইউরোপের যুক্তিবাদী মানবমুখী ঐহিক অভ্যুদয়বাদী ভাবধারা এদেশের চিন্তাজগতে অমোঘ আঘাত হানল। এই দেশের উচ্চবর্ণসম্ভূত হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় উপলব্ধি করল যে, এই দেশের দুর্গতির মূলে আছে ঐহিক-অনীহা'। বেদান্ত-সাংখ্য-বৌদ্ধদর্শন প্রভৃতি নিবৃত্তিপর শাস্ত্রগুলি সংসারকে, জীবনকে দুঃখময় বলে মানুষের মনকে জীবনবিমুখ অদৃষ্টবাদী, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে উদাসীন করে তুলেছিল। তাই পাশ্চাত্য জ্ঞান আহরণ করে ভারতের ঐহিক উন্নতি সাধনে তাঁরা অগ্রণী হলেন। এর জন্য তাঁরা সর্বপ্রথম শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। কিন্তু তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে, এই দেশের মানুষের চিন্তা ধর্মের দ্বারা এতই প্রভাবিত যে, ধর্মের মধ্যে যে গ্লানি প্রবেশ করেছে, তা দূর না করতে পারলে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা ব্যর্থ হবে। রামমোহন প্রথম বললেন, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে হলে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন; সংস্কার প্রয়োজন'। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রও বললেন— 'ধর্মের উন্নতি ব্যতীত সমাজ-সংস্কার কিসের জোরে হবে। রাজনৈতিক উন্নতিরও মূল ধর্মের উন্নতি।'

যে জাতীয় ধর্মের পুনরুজ্জীবন ব্যতীত ভারতের মঙ্গল নেই বলে তিনি মনে করতেন, সেই পুনরুজ্জীবিত হিন্দুধর্মের মূল কথাও তাঁর মতে, গীতাতেই বলা হয়েছে— মানুষের হিতসাধন, ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্বক নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান।

নবযুগের এই সাধকরা বুঝেছিলেন, কর্মবিমুখ এই জাতির মধ্যে কর্মচেষ্টা জাগ্রত না হলে জাতীয় অভ্যুদয় অসম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় এদেশে রজোগুণের চর্চা আবশ্যক। উপনিষদ থেকে তিনি শিক্ষা পেয়েছিলেন— 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' গীতা থেকে তাঁর শিক্ষা— 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ।' এইভাবেই ইউরোপের প্রভাবে নিবৃত্তিপর শাস্ত্র থেকে তাঁরা প্রবৃত্তিপর কর্মযোগের বাণী আহরণ করেছিলেন। কিন্তু ইউরোপের রাজসিক কর্মোন্মাদনার মধ্যে যে, সংযমের অভাব মানুষকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে তোলে, তা যে সুস্থ নয় তাও তাঁরা বুঝেছিলেন। জাগতিক উন্নতির জন্য কর্মে প্রবৃত্ত হতে হবে কিন্তু তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে লোকহিতের আদর্শের দ্বারা। অর্থাৎ রজোগুণকে সংযত করতে হবে সাত্ত্বিকতার সাধনা দ্বারা— গীতার কর্মযোগের রহস্য এটাই; যা সেদিন যুগসমস্যার মীমাংসা সূত্র রূপে তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। রামমোহন ধর্মের সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়ে বেদান্তকে অবলম্বন করেছিলেন। কারণ বেদান্তের মধ্যেই তিনি বিশ্বজনীন ধর্মের এক উদার আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন; যার ভিত্তিতে জাতীয় পুনরুজ্জীবন সম্ভব। কারণ বেদান্তের ধর্ম মূলত আধ্যাত্মিকতা। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দও বেদান্তকে সর্বাবয়ব ধর্মরূপে দেখেছিলেন। বলেছিলেন বেদান্তের আধ্যাত্মিক আদর্শ ভারতীয় জীবনের মূলমন্ত্র। বেদান্তকে অবলম্বন করলেও রামমোহন শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদকে গ্রহণ করেননি। কারণ শঙ্করের অদ্বৈতবাদ নিবৃত্তিপর হওয়ায় কর্ম সেখানে গৌণ। আর কর্ম যেখানে গৌণ নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি সেখানে দুর্বল। বঙ্কিমচন্দ্র বেদান্ত সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেনি। তিনি নীতিশাস্ত্রের পরাকাষ্ঠা পেয়েছিলেন গীতায়। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ বলেছিলেন গীতাই বেদান্তের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য। তিনি গীতার মধ্যেই নীতিতত্ত্বের চরম উৎকর্ষতা লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর মতে— যিনি সর্বভূতে ঈশ্বরকে সমবস্থিত দেখেন, তিনি কখনও অপরকে হিংসা করেন না। যেহেতু অপরকে হিংসা করলে নিজেকেই হিংসা করা হয়, সেজন্য কখনও অন্যকে হিংসা করতে নেই (১৩/২৮)। গীতার এই শ্লোকেই পরম নীতিতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে; যা অন্য কোনো গ্রন্থে, কোনোকালে বলা হয়নি।

মহামান্য তিলক এই ধারণা অনুসরণ করে সর্বপ্রথম নীতিশাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ বিচার করেছেন বেদান্তের অধ্যাত্মজ্ঞানের ভিত্তিতে। তিলক প্রমাণ করেছেন, গীতার কর্মযোগ প্রকৃতপক্ষে ব্যবহারিক বেদান্ত। তিলকের গীতা সম্পর্কে এই অভিমত সেদিনের সদ্যোজাগ্রত স্বাজাত্যবোধের এক অভিব্যক্তি। এইখানেই তাঁর গীতারহস্যের ঐতিহাসিক তাৎপর্য।

লোকমান্য তিলকের মতে, নিম্নের শ্লোকেই গীতার সমগ্র তাৎপর্য সূচিত হয়েছে—

''কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভুঃ মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।।''

—অর্থাৎ (১) কেবল কর্মেই তোমার অধিকার; (২) ফলে তোমার অধিকার নেই, (৩) কর্মফলের কারণ হইও না, (৪) অকর্মে (কর্মত্যাগে) যেন প্রবৃত্তি না হয়। এখন প্রশ্ন, কর্ম কাকে বলে? শ্রীভগবান বলেছেন— 'যজ্ঞার্থাৎ কর্মনোঽন্যত্র লোকোত্রয়ং কর্মবন্ধনম্।' অর্থাৎ যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম ব্যতীত অন্য সকল কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। লোকমান্য তিলকের মতে, নিষ্কাম বুদ্ধিতে কিংবা ব্রহ্মার্পণ বিধির দ্বারা অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্মই যজ্ঞ। এর জন্যই স্বধর্ম বিহিত কর্ম লোকসংগ্রহার্থ করতে হবে। অর্থাৎ স্বকীয় প্রকৃতির (স্বধর্ম) অনুকূল কর্ম লোকসংগ্রহের জন্য (আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য) নিষ্কামভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ করে অনুষ্ঠান করতে হবে। এটাই তিলকের মতে প্রবৃত্তিমূলক ভাগবতধর্ম। যার মূল সূত্র— 'মামনুস্মর যুধ্য চ।' লোকমান্য তিলক এই ভাগবতধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। গীতার কর্মযোগকে কীভাবে জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করে তারই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

এখন প্রশ্ন হলো, আজকের দিনে 'গীতারহস্য' গ্রন্থের এই সিদ্ধান্ত কতখানি উপযোগী? গীতারহস্যে তিলক যে কর্মযোগের কথা বলেছেন তা কী সত্যই প্রয়োজনীয়? আমাদের মনে হয় গীতারহস্যে লোকমান্য তিলক যে কর্মযোগের কথা বলেছেন তা সর্বকালীন। কোনোদিন তার প্রয়োজন নিঃশেষ হবে না। কারণ, মানুষ যতদিন এই জগতে থাকবে ততদিন তাকে কর্ম করতে হবে। কারণ কর্ম করাই তার প্রকৃতি। তাই সেই যখন কর্ম করতেই হবে, তখন তা নিষ্কামভাবেই করা শ্রেয়। তাতে কর্মফলের দ্বারা আবদ্ধ হতে হবে না। আর নিষ্কাম কর্ম কী? লোকহিতয়ে কর্ম। লোকসংগ্রহার্থ কর্ম। আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য কর্ম। তাই যতদিন না মানুষ সম্পূর্ণভাবে লোকহিতায় কর্ম করতে অভ্যস্ত হবে ততদিন পর্যন্ত গীতারহস্যের প্রয়োজনীয়তা থাকবে।

(লেখক উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক)

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর,
বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

গীতার মর্মবাণীই ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার মূল ভিত্তি

সুনীল কুমার দাস

গীতা ভগবানের বাণী। এটি মনুষ্য জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর করার পন্থাসংবলিত একটি অলৌকিক দিব্যগ্রন্থ। এর প্রতিটি বাণী নিখুঁত, সুচিন্তিত, বাহুল্যবর্জিত এবং অতি সংক্ষিপ্ত। মাত্র সাতশো শ্লোকের মাধ্যমে বেদান্তসমূহের সমগ্র জ্ঞান এই গ্রন্থে অভিব্যক্ত হয়েছে। গীতায় ভক্তি জ্ঞান লাভের উপায় বর্ণিত আছে। আবার কেমন ভাবে কর্ম করলে, কর্ম বন্ধনের কারণ না হয়ে মুক্তির কারণ হয়ে উঠবে— তার উপায়ও নির্দেশিত হয়েছে এই গ্রন্থে। নিয়মিত গীতা পাঠ করলে চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্তের শুদ্ধতাই মানুষের অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করে। জ্ঞানের উন্মেষ ঘটায়। নিরন্তর গীতা পাঠ মানুষকে ধীরে ধীরে সেই জ্ঞানের জগতে নিয়ে যায়। আর এই জ্ঞানের শক্তিই ক্রমশ তাকে শুদ্ধ কর্মে প্রণোদিত করে। কেননা জ্ঞান ছাড়া কর্ম কেবল বন্ধনের কারণ। আবার জ্ঞানের স্পর্শ সহায়ে বিশোধিত এই কর্ম সমূহই মানুষকে নির্মল চরিত্র প্রদান করে থাকে। বলা বাহুল্য এই চরিত্রই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। মানুষ এই চরিত্র বলের দ্বারাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার কল্যাণকারী শক্তি প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়। গীতায় অতি অদ্ভুত এক রহস্যময় চরিত্র গঠনকারী শক্তি আছে। এই শক্তিই মানুষকে তার মনুষ্যত্ব অর্জন করায়। প্রতিনিয়ত গীতা চর্চা এবং এর তত্ত্বানুসন্ধান ক্রমশ তাঁকে দেবত্বে উন্নীত করে। গীতার পন্থা অনুযায়ী নিরন্তর জীবন গঠনের প্রয়াস সাধককে এমন এক স্তরে নিয়ে যায়, যার ফলে তিনি 'আত্ম-সাক্ষাৎকার' লাভ করতে সমর্থ হন এবং ঈশ্বরের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করে পরা-শান্তির অধিকারী হয়ে ওঠেন। গীতা দিকভ্রান্ত, বিমূঢ় চিত্ত মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেখায়। এর অন্তর্নিহিত ভাবরাশির মধ্যেই নিহিত আছে এক অদ্ভুত কল্যাণকারী শক্তি, যেটি তার অনুসরণকারী মাত্রেরই হিতজনক। গীতা শক্তির উৎস। শান্তির

আশ্রয়। সাফল্যের চাবি-কাঠি। এটি সব সময় অভয়প্রদ। মঙ্গলজনক। বিপদে নিজেকে স্থির রাখার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরণাযুক্ত এবং সবাইকে ভালো রাখার মহামন্ত্র স্বরূপ। এর সর্বব্যাপী বিশ্বজনীন দৃষ্টি সমস্ত রকম সংকীর্ণতা বিবর্জিত এবং রাষ্ট্র ও সমাজের পক্ষে হিতজনক বহুবিধ মূল্যবোধে পরিপূর্ণ। দেশবাসীর উচিত এখান থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নেওয়া এবং অজস্র জ্ঞানের আকর এই গ্রন্থটির উপযুক্ত মূল্য দেওয়া। দুর্ভাগ্যবশত তথাকথিত কিছু উদারপন্থী নিজেদের ধর্ম নিরপেক্ষ প্রতিপন্ন করতে গীতার বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁদের জানা দরকার— গীতার বিরোধিতা করলে, দেশের ধর্মনিরপেক্ষ নীতিরই বিরোধিতা করা হয়। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা বোধের মূল সূত্রটি গীতাতেই নিহিত আছে।

গীতা গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।।

''হে পার্থ, যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্য সর্বপ্রকারে আমার পথের অনুবর্তী হয়।''— (গীতা-জ্ঞান যোগ-১১ শ্লোক)। গীতা কথিত এই বাণী পৃথিবীর সমস্ত ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায় সমূহকে সম-মর্যাদাযুক্ত একাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 'যত মত-তত পথ', গীতোক্ত ওই মহাকাব্যেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। আসলে গীতার মধ্যে কোথাও এমন কোনো বক্তব্য দৃষ্টিগোচর হয় না, যাতে মনে হতে পারে এটি কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য রচিত। গীতা সকলেরই অনুসরণযোগ্য ও প্রয়োগসাধ্য একটি অমূল্য গ্রন্থ। এর চর্চা সকলের কাছেই সমান ফলপ্রসূ। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন,— যারা হিন্দুদের মতো অবতারে বিশ্বাসী নন বা জন্মান্তর মানেন না, তারাও কি গীতা চর্চা করবেন এবং সমভাবে তাদের মতোই গীতা পাঠের সুফল লাভ করতে সমর্থ হবেন? উত্তরে বলা যায়— যিনি যে ধর্মেই যুক্ত থাকুন অথবা যে ধর্মেরই অনুষ্ঠান করুন, গীতোক্ত নীতিসমূহ তার সেই ধর্মকে আরও নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর করতে যথার্থই সহায়ক হবে। গীতা সকলেরই। এ সম্পর্কে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য— ''এই গীতোক্ত ধর্ম সমস্ত মনুষ্যের জন্য। জন্মান্তরে যে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে না করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে ভক্তি না করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম; যে ঈশ্বরে বিশ্বাস নাও করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম; কেন না চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সংযম অনীশ্বরবাদীর পক্ষেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম; সেই চিত্তশুদ্ধি এই গীতার উদ্দেশ্য। এরূপ বিশ্বলৌকিক ও সর্ব্বব্যাপক ধর্ম আর কখনও পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। যাঁহার যতটুকুতে অধিকার, তিনি ততটুকু গ্রহণ করিবেন।''

গীতা সর্ব শাস্ত্রের সার, যাবতীয় শ্রেষ্ঠনীতির আকর এবং বেদান্ত সমূহের ঘনীভূত রূপ মাত্র। এর প্রশস্তি করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এই মহাগ্রন্থের প্রতি আমরা যেন যথোচিত মর্যাদা দিতে উদ্‌যোগী হই। আর প্রার্থনা করি গীতার কল্যাণকারী চিন্তা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হোক।

(লেখক রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত একজন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক)

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ও বর্তমান রাজনীতি

সুভাষ মণ্ডল

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা সর্বশাস্ত্রের সার এবং এই সর্বোৎকৃষ্ট শাস্ত্রের কালজয়ী রচনাকার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। তাঁর তুল্য মনীষীর সন্ধান খুব কম পাওয়া যায়। আজকাল এই মহান শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, বিরূপ আলোচনা ও কটূক্তি দেখা যাচ্ছে।

বস্তুত এই 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা' কী এবং কী নয় বুঝতে হলে মহাভারত সহ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার আলোচনা ও মূল্যায়ন করতে হবে। প্রবাদেই আছে 'যা নেই ভারতে তা নেই মহাভারতে'। প্রখ্যাত মনীষীগণও বলেছেন— 'যোগ ছাড়া ভারত নেই এবং ভারত ছাড়া যোগ নেই।' ভারত শব্দের অর্থ— 'ভা' ধাতুর অর্থ দ্যুতি, দীপ্তি, আলো, জ্ঞান। 'র'-বহ্নিবীজ, চরণ। 'ত' অর্থে তরে যাওয়া, ভেলা, তরী প্রভৃতি। জ্ঞানী তাঁদেরই বলা হয় যিনি 'মুক্ত' হয়েছেন। ইন্দ্রিয়বিজয়ী হতে পেরেছেন। যিনি যুক্ততম অবস্থায় আছেন, ব্রহ্মে স্থিতিসম্পন্ন হলে তবেই জ্ঞান লাভ করেন। (গীতা ৫ম অঃ ২১।) উল্লেখ্য, আজকের দিনে এরকম বিরল মানুষ কোথায় দেখা যায়! আজকের সমালোচকরা গীতার কিছু শ্লোক পাঠ করে, কিছু ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা দেখে; নিজেদের মননশীলতা ও পাণ্ডিত্য ফলাতে গিয়ে, পৃথিবীর কালজয়ী সর্বোৎকৃষ্ট সর্বশাস্ত্রের সার গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার বিরূপ সমালোচনা করে জনসমাজে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে নিজের সর্বনাশ সহ ভারতের সর্বনাশ করতে চাইছেন।

এর জন্য একলব্যীয় গুরুভক্তির নিদর্শন নয়, অর্জুনের মতো গুরুভক্তির সংস্কৃতি সহ অভিষ্ট লক্ষ্যেই রাজনীতি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠনীতিকে পরিচালিত করতে হবে। রাজনীতি একমাত্র রাজবিদ্যার দ্বারা অর্জিত হয়। আদৌ সেই রাজবিদ্যার ঝলক পশ্চিমবঙ্গ কেন, ভূ-ভারতে কোথাও প্রদর্শিত হচ্ছে কি? যদি হতো তাহলে আমাদের এত মারামারি, দলে-দলে দলাদলি, গালাগালি, খুন, জখম, ধর্ষণ, রক্তপাত, দেখতে হচ্ছে কেন? শিশু থেকে বৃদ্ধা-বৃদ্ধ কেউ আজ নিরাপদ নয় কেন?

গীতাশাস্ত্রের পরিচয় সেই গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ের শেষে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, "ওঁ শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে...যোগ নাম...হধ্যায়ঃ"।। এটি ব্রহ্মবিদ্যার্জনের জন্য যোগশাস্ত্র। এখানে বেদ-উপনিষৎ সহ সমস্ত শাস্ত্রের সার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির মাধ্যমে বর্ণিত রয়েছে। কোনো প্রকারের অনুমান বা কল্পনার অনুভব নেই। এই শাস্ত্রের নবম অধ্যায়ের ২য় শ্লোক 'রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।/ প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম —অর্থাৎ এটি রাজবিদ্যা, শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠতম, রাজগুহ্যং— শ্রেষ্ঠ গুহ্য, গুপ্ততম, পবিত্র হতে পবিত্রতম, উত্তম হতে উত্তমতম; প্রত্যক্ষাবগমং— প্রত্যক্ষ্যের দ্বারা বোঝা যায়। ধর্ম্ম্যং—তিনিই ধর্ম। সুসুখং— নিকটে সুখানুভব হয়। কর্ত্তুম অব্যয়ম— যার কোনো ক্ষয় নেই। অপিতু বর্তমান গণতন্ত্র— যা রাজবিদ্যার প্রয়োগবিহীন মানবমনের অবস্থার উপর নির্ভরশীল এবং মন সর্বদা পরিবর্তনশীল এবং ফলের প্রতি (ক্ষমতা) আসক্ত; অন্ধ-ক্ষমতান্ধ, মোহান্ধ, মমতান্ধ রাজনীতির পরিবর্তন সুশাসনের নিমিত্ত বাঞ্ছনীয়। রাজনীতির পরিবর্তন সুশাসনের নিমিত্ত বাঞ্ছনীয়। একলব্যীয় রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির রূপরেখাতে ইতিহাসের পাতায় অমর হতে পারে কিন্তু সামগ্রিকভাবে জনগণের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়।■

বৈষ্ণবনগরে জাতীয়তাবাদী শক্তি কীভাবে জিতলো

বিগত লোকসভা নির্বাচনে আমরা বৈষ্ণবনগর বিধানসভা ক্ষেত্রে ৪৮ হাজার ভোট পেয়েছিলাম। জয়ের জন্য আমাদের দরকার অন্তত ৭০ হাজার ভোট অর্থাৎ ২২ হাজার ভোট আমাদের বাড়াতে হবে। সেই সময় আমরা ছিলাম ভোট প্রাপ্তির নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে, কংগ্রেস প্রথম স্থানে। এবারে সংকল্প ছিল, আমাদের প্রথম হতে হবে। কালিয়াচকের ঘটনায় হিন্দুরা যে অপমানিত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে, শাসকদলের শক্তির বিরুদ্ধে একটা জবাব দিতে না পারলে হিন্দুদের মনোবল তলানিতে ঠেকে যাবে। অন্তত এই সিটটা জিততে পারলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলা যাবে।

শুরু হলো বুথভিত্তিক সমীক্ষা। কত ভোট লোকসভায় পেয়েছিলাম আর কত ভোট পেতে হবে। আমরা ১৫ দিন ধরে প্রতিটি বুথের আলাদা আলাদা টারগেট তৈরি করলাম। বৈষ্ণবনগর বিধানসভার ১৪টি অঞ্চলের জন্য ১৪ জন প্রমুখ ও ১৪ জন সহ প্রমুখ। তারা বুথ ভিত্তিক বৈঠক শুরু করল। তখন ভোটের ৩ মাস বাকি।

ঠিক হলো প্রতি গ্রামে ৩ বার করে গ্রামের লোকদের নিয়ে বৈঠক হবে এবং প্রতি বাড়িতে দু'বার করে যাওয়া হবে। পাঁচশো জন জাগরণ কর্মী বৈষ্ণবনগর বৈষ্ণবনগর মন্ত্র জপ করতে শুরু করি। উল্কার বেগে সকলে মিলে বিধানসভা ক্ষেত্রের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবিরাম ছুটে চলার পরিকল্পনা হলো— কোনো একটি গ্রাম বাদ নয়, কোনো একজন হিন্দু বাদ নয়।

১৮০টি বুথে তৈরি হলো বুথ জাগরণ কমিটি। এই কমিটি ভারতীয় জনতা পার্টির বুথ কমিটির অতিরিক্ত। প্রতি অঞ্চলে বুথ প্রমুখেরা বিজেপির সঙ্গে তালমিল সর্বদা বজায় রেখে চলত। প্রতি বৈঠকে যখন কালিয়াচকের ঘটনার কথা বলা হচ্ছিল, তখন যুবকদের চোখে মুখে যে প্রদীপ্তি দেখা গিয়েছিল, তাতেই বুঝতে পারা গিয়েছিল জয় আমাদের অসম্ভব নয়। কোনো মিডিয়া এই কেন্দ্রে বিজেপিকে জয় দেখায়নি। এমনকী বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিও এগিয়ে রেখেছিল কংগ্রেসকে। আর তাতেই জেদ বেড়েছিল সবার। দাঁতে দাঁতে চেপে শুরু হলো লড়াই। জাগরণ কর্মীদের রাত ও দিন সমান হয়ে গিয়েছিল— মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন। সারাদিন প্রচার ও জনসম্পর্ক, তারপর সারারাত গ্রাম পাহারা দিতে হয়েছিল।

আমরা জাগরণ টিম তৈরি করার সময় পাঁচটি দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলাম। পাঁচ স্তরে ২ জন করে জাগরণ কর্মী নিয়ে মোট দশজনের গ্রাম জাগরণ টিম তৈরি করা। টিমের স্বরূপ ও কাজ হোত :

(ক) আর্থিক ব্যবস্থা সুচারু রূপে দেখাশুনা করা।

(খ) সাহসী যুবক ২ জন। যেন জনজাগরণের কাজ ব্যাহত না হয়।

(গ) উৎসাহী মহিলাকর্মী। তাদের কাজ মাতৃজাতিকে সচেতন ও সঙ্ঘবদ্ধ করা।

(ঘ) প্রভাবী ও প্রতিষ্ঠিত ২ জন, যারা জনমত প্রতিষ্ঠিত করবেন।

(ঙ) অতিসাধারণ কিন্তু অন্ধ ভক্ত। যারা পোস্টার সাটা, ফ্লাগ টাঙানো, রিক্সা করে অসুস্থ ও বয়স্কদের ভোটদান কেন্দ্রে নিয়ে আসবে।

এই পঞ্চ পরিকল্পনার জন্য হিন্দু ভোট দানের হার অন্যদের থেকে ৫ শতাংশ বেশি হয়েছে। হিন্দুরা যেখানে ৮৮ শতাংশ ভোট দিয়েছিল অন্যরা সেখানে ৮৩ শতাংশ ভোট দিয়েছে যা পশ্চিমবঙ্গে প্রথম। এটিই ছিল 'জয়ের মূল কারণ।

মূলত এভাবে পরিকল্পনার জন্য এই বিধান সভায় আমাদের জয় সুনিশ্চিত হয়েছিল।

অবশ্য বেশ কয়েকজন প্রবীণ ও নবীন প্রচারক ও কার্যকর্তা এই ক্ষেত্রের ভূমি আমাদের জন্য উর্বর ভাবে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। এই জাগরণ কার্য সুসম্পন্ন করতে একজন প্রচারকের অবদানের কথা বার বার মনে পড়েছে, তিনি হলেন স্বর্গীয় সুধাময় দত্ত। বৈষ্ণবনগর বিধান সভায় সর্বত্র একসময়ে তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। সুধাময়দার নাম বলতেই বহু গ্রামের প্রবীণরা স্মৃতিমেদুর হয়ে তাঁর কথা শুরু করে দেন। তাঁর আত্মার শান্তির জন্য আমাদের এই সিটটা জিততে হবে— একথা উঠে আসে সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেই। যা ছিল আমাদের প্রেরণার পাথেয়।

এক অঞ্চলের স্বয়ংসেবকদের তথা জাগরণ কর্মীদের দায়িত্ব অন্য অঞ্চলে দেওয়া হয়েছিল এতে কাজ করার উৎসাহ বহু গুণ বেড়ে গিয়েছিল। নিশ্চিত ভাবে অনুভব করা গেছে অন্যেরা যা খরচ করেছে তার এক পঞ্চমাংশও আমরা খরচ করিনি বা করার প্রয়োজন পড়েনি বা সামর্থ্য ছিল না। জাগরণ কর্মীদের হাত দিয়ে অর্থের খরচ যেন এক সুন্দর আর্ট। যা গবেষকদের গবেষণার বিষয় অনায়াসে হতে পারে। জনমত তৈরি করতে পারলে আর্থিক শক্তির ততটা প্রয়োজন হয় না তার প্রমাণ বৈষ্ণবনগর জয়।

জাগরণের সকল স্বয়ংসেবক বন্ধুরা ভাববেন ২০১৬-য় বৈষ্ণবনগর বিধানসভা জয়ের জন্য তাদের খুব কম হলেও কিছু অবদান রয়েছে। এই স্মৃতি চিরদিন অমলিন থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা এক হতে পারে। শাসকদলের চোখরাঙানি, মৌলবাদী শক্তি ও আর্থিক প্রলোভন উপেক্ষা করে দেশ রক্ষার জন্য এক হতে পারে বাঙালি হিন্দুরা।

—রাজু কর্মকার,
কালিয়াচক, মালদা।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দাতব্য

গূঢ়পুরুষের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান জানিয়ে ৬ জুন ২০১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর লেখা সম্পর্কে কিছু ভিন্ন মত জানাচ্ছি।

তিনি লিখেছেন, ''উন্নয়নের নামে এইসব দাতব্য কর্মের বিনিময়ে তৃণমূল কংগ্রেস ২১১টি আসন জিতে একাই নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা নিয়ে দ্বিতীয়বার সরকার গড়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দাতব্য যে এক নয় তা অজানা নয়।'' কার অজানা, কারই বা জানা? এই জানা-অজানার তাৎপর্য বা রহস্যটুকু জানা দরকার। ধূর্ত বিশ্বপুঁজিবাদ তাদের সংগঠন ডব্লুউ টি ও'র মাধ্যমে গরিব দেশগুলিতে যে উন্নয়ন-নামক তথাকথিত অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি চালু করেছে, তা যে কোনোভাবেই ওই দেশগুলোর মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে না, তা তারা ভালভাবেই জানে। তাই তারা তাদের পোষ্য পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে রটায় যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন মানে জনমুখী কর্ম করা নয়। তাহলে কী কম্ম করা? সংস্কারের নামে জাতীয়শিল্প ও অর্থনীতিকে সংরক্ষণের বিধিনিষেধ তুলে দিয়ে জাতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়া ইত্যাদি। এইসব জনবিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করে পৃথিবীর বহু সরকারই জনরোষের শিকার হয়েছে। মনমোহন সিং সরকার এই জনরোষের শিকার হয়েছে। বাজপেয়ী সরকারও ডিসইনভেসমেন্ট, এফ ডি আই ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের পেনশন তুলে দিয়ে জনরোষের শিকার হয়েছিল। এই অমানবিক পাশ্চাত্য পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্ধ অনুসরণ করলে মোদীজীরও একই পরিণতি হতে বাধ্য।

এবার আসি আপনার দানখয়রাতির প্রশ্নে। আপনার অভিযোগ দিদি কেন জনগণকে দানখয়রাতি করছেন। অথচ মোদীজী যে কর্পোরেট হাউসগুলির ঋণ মুকুব, ট্যাক্স মুকুব এবং অনাদায়ী ট্যাক্স খাতে কোটি কোটি টাকা কোষমুক্ত করছেন সেগুলো কী দানখয়রাতি নয়? নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের উপর এক টাকা ভরতুকি দিতেও তাঁর আপত্তি। এদেশে অনলাইনে পণ্য বিক্রিতেও বিদেশিরা ব্যবসা করছে কোনো ট্যাক্স না দিয়েই। কী বলবেন আপনি— কে দায়খয়রাতি করছে? দিদি, না মোদী? রাজকোষাগারতো জনকল্যাণের জন্যই। বণিকের মানদণ্ড, রাজদণ্ডে পরিণত করার জন্য নয়। ভারতীয় নীতি শাস্ত্রেতো রাজাকে প্রজাবৎসল হওয়ারই নির্দেশ দেওয়া হোত। কূপ, পুষ্করিণী খনন ও সংস্কার করাটাও রাজার কাজ ছিল। যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের আয়ের কোনো নিশ্চয়তা নেই, অবসর জীবনের সুরক্ষা বলে কিছু নেই, সে দেশের মানুষের জন্য কিছু জনমুখী প্রকল্প গ্রহণ করলে সেই সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কিছু দুশ্চিন্তা করতে হয় না।

রাজ্য সরকারকে দানখয়রাতির জন্য অভিযুক্ত করে সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিখেছেন এগুলো সবই কেন্দ্রীয় প্রকল্প। অর্থাৎ তাঁর দুঃখ বিজেপি কেন এই দানখয়রাতির সুযোগ নিতে পারল না। বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য কী দিদি দায়ি? রাজ্য কর্মচারীদের ইনটারিম রিলিফ দেওয়াতেও তাঁর আপত্তি। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কর্মচারীদের ১০ বছরে একবার বেতন বৃদ্ধি হয়। তাতেও আপত্তি। তিনি কী তাঁর বাড়ির কাজের লোকের বেতন বাড়ান না? ব্যয়তো হবেই। শুনতে এক লক্ষ কোটি টাকা ব্যয়। দেশটা যে বড্ড বড়। ওই টাকা ভাগ হবে এক কোটি কর্মচারী ও পেনশনারদের মধ্যে। ব্যাঙ্ক ডাকাতি ও দুর্নীতি কেলেঙ্কারিতে এর চেয়ে অনেক বেশি সরকারি অর্থের অপচয় হয়। মোদী সরকারকে সমর্থন করতে গিয়ে আপনারাইতো ক্রমশ জনবিরোধী, কর্মচারী বিরোধী হয়ে উঠছেন। এটা শুভ লক্ষণ নয়। রাষ্ট্রের কাজ ব্যবসা করা নয়, রাষ্ট্রের নাগরিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের মাধ্যমে নাগরিকদের রাষ্ট্রবাদী করে তোলাই রাষ্ট্রনায়কদের কাজ। রাষ্ট্রের প্রতি অসন্তোষ বৃদ্ধি করা নয়।

আর্থিক সংকট কিন্তু রাজ্যের চেয়ে অনেক বেশি কেন্দ্রের। কেন্দ্রের এমন কোনো আর্থিক দিক নেই যাতে ঘাটতি নেই। বাজেট ঘাটতি, বাণিজ্য ঘাটতি, রাজকোষ ঘাটতি, রাজস্ব ঘাটতি, কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ঘাটতি ইত্যাদি। এর উপর রয়েছে অভ্যন্তরীণ ঋণ, বিদেশী ঋণ। শেয়ার মার্কেটের বিদেশি পুঁজিও আমাদের ঋণ। হঠাৎ একসঙ্গে ফেরৎ চাইলেই দেশের অর্থনীতি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে।

রাজ্যের চেয়ে দেশের কথাই আমাদের বেশি ভাবা উচিত কারণ মোদীজী যে পথে আর্থিক উন্নতি করতে চলেছেন তা বোখরেজী ও ঠেংড়ীজীর কল্পনার জাতীয় আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলার মানবিক পথ নয়। পাশ্চাত্যের অমানবিক পুঁজিবাদী পথে নয়। এ পথে জাতীয় বলে কিছু নেই।

—নারায়ণ চন্দ্র দে,
লেকটাউন, কলকাতা।

গোপীনাথ কবিরাজ

স্বস্তিকায় প্রকাশিত (২৭ জুন) মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের জীবনবৃত্তান্ত এবং 'সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান'-এ পরিবেশিত তথ্যে কতক পার্থক্য দেখা যায়।

সংসদের চরিত্রাভিধান অনুযায়ী— তাঁর জীবনাবসান হয়েছে ১৯৭৬ সালের ২২ জুন, ১২ জুন নয়; তিনি এম.এ. ডিগ্রি পান ১৯১৩ সালে, ১৯১৪ সালে নয়; ১৯৬৪ সালে তিনি 'পদ্মভূষণ' পান, 'পদ্মবিভূষণ' নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ আরও কয়েকটি সম্মান ভূষিত হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডি. লিট.', ১৯৬৫ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকার প্রদত্ত 'সাহিত্য বাচস্পতি' এবং ১৯৭৬ সালে বিশ্বভারতীর 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে সম্মানিত হয়েছিলেন।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

শ্রবণবেলগোলায় বাহুবলী মন্দির।

কর্ণাটকে প্রাচীন ভারতের অপরূপ স্থাপত্যকলা

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

সকালে গাড়িতে রওনা হলাম মহীশূর থেকে ৮৩ কিমি দূরে 'শ্রবণবেলগোলা'র উদ্দেশে। 'শ্রবণবেলগোলা' জৈনদের পবিত্র তীর্থস্থান। সেখানে আছে প্রভু গোমতেশ্বরের বিশাল মূর্তি, যা দেখতে পাওয়া যায় সেখানে পৌঁছবার বহু আগে থেকেই পাহাড়ের মাথার উপর অবস্থানের জন্য। গাড়ি মহীশূর শহর ছাড়িয়ে গ্রামের রাস্তা ধরেছে। রাস্তার দুধারে চাষের মাঠ ও নারকেল বাগান। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার প্রদীপ জানায়, শ্রবণবেলগোলা মানে শ্রবণ অর্থাৎ জৈন সন্ন্যাসী আর কর্ণাটক ভাষায় 'বেল' অর্থাৎ সাদা ও 'গোলা' শব্দের অর্থ পুকুর বা সরোবর। ওখানে একটি সরোবর আছে যাকে বলা হয় 'শ্বেত সরোবর'। যা জৈনদের নিকট পবিত্র সরোবর হিসাবে খ্যাত। মহীশূর থেকে শ্রবণবেলগোলা ১১৮ কিলোমিটার। দুটি ছোট পাহাড়ের মাঝে চারিদিক বাঁধানো পবিত্র সেই শ্বেত সরোবর। একধারে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে যেটি বড় পাহাড়, তার নাম ডোডাবেটা বা ইন্দ্রগিরি। যার মাথায় রয়েছে গোমাতশ্বরের বিশাল মূর্তি। অপরদিকে অপেক্ষাকৃত একটি ছোট পাহাড়ের নাম চন্দ্রগিরি। এই চন্দ্রগিরি পর্বতেই রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও তাঁর গুরু ভদ্রবাহু আসতেন সাধনা করতে। মহারাজা অশোক খৃষ্টপূর্ব তিন শতকে এই চন্দ্রগিরি পর্বতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের একটি মন্দির নির্মাণ করেন। পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত জৈন সন্ন্যাসীরা এখানে সাধনা করতে আসতেন। ক্রমে আঁকা বাঁকা পথ পেরিয়ে আমরা হাজির হলাম

পরম্পরা

শ্রবণবেলগোলায়। রাস্তা থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে পাহাড় কেটে তৈরি সিঁড়ি উঠে গেছে এঁকে বেঁকে পাহাড়ের মাথার দিকে। এখান থেকে আর কোনো মূর্তি দেখা যায় না। উঠতে হবে ৬১৪টি সিঁড়ি ভেঙে ১৪৩ মিটার বা ৪৭০ ফুট উঁচুতে। কিছুটা উপরে উঠলে চোখে পড়ে আমরা পিছনে ফেলে এসেছি সেই চারিধার বাঁধানো পবিত্র শ্বেত সরোবর ও তার ওপরে চন্দ্রগিরি পর্বত। পাহাড়ের গা কেটে ছোটবড় ধাপে তৈরি সিঁড়ি দিয়ে আমরা ক্রমশ উপরের দিকে উঠতে থাকি।

অবশেষে আমরা মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে এসে পৌঁছলাম। পাথরের তৈরি অতি প্রাচীন মন্দির। প্রবেশদ্বার পাথরের তৈরি গেটের মধ্য দিয়ে। চারিপাশ পাথরের চাঙড় দিয়ে তৈরি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ভিতরে প্রবেশ করলে চোখে পড়ে মন্দির রয়েছে প্রায় ১০/১২ ফুট উঁচু পাথরের মঞ্চের উপর। আয়তকার মঞ্চের মধ্যভাগ থেকে লম্ব ভাবে বেরিয়ে এসেছে একটি মণ্ডপ। এই মণ্ডপ দিয়েই প্রবেশ পথ। মন্দিরের চারপাশে ইতস্তত কিছু ছোট বড় পাথরের পরিকাঠামো রয়েছে। এক ধারে প্রাচীরের গা ঘেঁসে একটি বড় স্তম্ভ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। মাথার উপর একটি ছোট বর্গাকার মণ্ডপ। এটা হলো ব্রহ্মদেব স্তম্ভ। গঙ্গা স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম অঙ্গ এই স্তম্ভ। ৯৭৪ খৃ. এই স্তম্ভটি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দুস্থাপত্য শিল্পের দীপদান বা ধ্বজস্তম্ভের মতো এই স্তম্ভ। দু'ধরনের স্তম্ভ দেখতে পাওয়া যায়। মানসস্তম্ভ ও ব্রহ্মস্তম্ভ। মানসস্তম্ভের মাথায় মণ্ডপে থাকত দাঁড়ানো জৈন মূর্তি এবং ব্রহ্মস্তম্ভে ব্রহ্মার বসা মূর্তি। কিছু দূরেই আর একটি স্তম্ভ রয়েছে যার নাম ত্যাগড়া ব্রহ্ম পিলার, যা ৯৮৩ খৃ. রাজা চৌন্দরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মন্দির থেকে পেরিয়ে পিছনের দিকে আর এক প্রস্ত সিঁড়ি ভেঙে পৌঁছলাম আর একটি গেটের সামনে। এই গেটকে বলে 'অখণ্ড বাগিলু'। গেটের দুপাশে পাথরের পিলার শোভিত দুটি অলিন্দ সমেত কক্ষ। এই কক্ষদুটি যুক্ত হয়েছে পরবর্তীকালে

১১৩০ খৃ.। গেটের মাথার উপরে রয়েছে একটি মাত্র পাথর কেটে তৈরি অপূর্ব 'গজ-লক্ষ্মী' প্যানেল। যার মধ্যভাগে রয়েছে ভগবান লক্ষ্মীর মূর্তি, তার দুই পাশে দুইটি হাতি তাদের শুঁড়ে করে দুটি পাত্র দ্বারা মায়ের মাথায় চন্দন বা পবিত্রবারি ঢালছে। প্যানেলের উপরিভাগে কুমির ও সিংহের মুখের কাজ করা আছে। দেশের মধ্যে এরূপ বৃহৎ একটি মাত্র পাথরের উপরে কাজ করা গজলক্ষ্মী প্যানেল বিরল। গঙ্গারাজাদের সময়ে তৈরি স্থাপত্য শিল্পের এ এক অনবদ্য নিদর্শন। এই গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকলে আবার সিঁড়ি উঠে গেছে উপরিভাগে, যার শেষ প্রান্তে পৌঁছলে আর একটি মন্দির। এ মন্দিরের পিলারের গায়ে পাথর কেটে কাজ করা। পিলারগুলি কোনটি চতুর্ভুজ, আবার কোনটি বহুভুজাকৃতি। ভিতরে প্রবেশ করলে সামনেই দেখা যায় খোলা আকাশের নিচে বাহুবলী তথা গোমতেশ্বরের বৃহৎ মূর্তি। আর চারিপাশ অলিন্দ দিয়ে ঘেরা। সামনে ও দুই পাশের অলিন্দে ২৪ জন তীর্থঙ্করের মূর্তি। সামনের অলিন্দের মাথায় পাথরের তৈরি পাঁচটি দেবীমূর্তি রয়েছে, পাঁচটি আলাদা আলাদা আর্চ যুক্ত গবাক্ষের মধ্যে।

ইন্দ্রগিরি পর্বতে গোমতেশ্বরের মূর্তি একটি মাত্র গ্রানাইট পাথর কেটে তৈরি, মোনোলিথিক মূর্তি। ৯৮১ খৃ. আচার্য নেমীচন্দ্র সিদ্ধান্ত চক্রবর্তী এই মূর্তির উদ্বোধন করেন। নিরাভরণ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দাঁড়ানো এই মূর্তির উচ্চতা ৫৮ ফুট, চওড়া ২৬ ফুট ও পায়ের পাতা ১০ ফুট। দুই পদদ্বয়কে পেঁচিয়ে সাপের মতো লতাপাতা উঠে গেছে দুই বাহু পর্যন্ত। চওড়া কাঁধ এবং হাত দুটি শরীরের দু'পাশে লেগে রয়েছে অখণ্ড বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। প্রতি ১২ বছর অন্তর এই মূর্তির মহামস্তক অভিষেক হয়। সেই সময় ১০০৮ ঘড়া পবিত্রজলের সঙ্গে দুধ, দই, ঘি, চিনি, ফলমূল, সোনারূপার গহনা, টাকাপয়সা ইত্যাদি দিয়ে অভিষেক করা হয়। প্রথা অনুসারে মহীশূর রাজপরিবারের প্রধান প্রথম অভিষেক করেন। গত ২০০৫ সালে অভিষেক হয়েছে, আবার ২০১৭ সালে হবে। লাখো লোকের ভিড় হয় সেই অভিষেক অনুষ্ঠানে। আসার সময় দেখলাম পাহাড়ের গায়ে বড় বড় আয়তকার কাঁচ দিয়ে ঢাকা কিছু জায়গা, এগুলি এই পাহাড়ের গায়ে বিভিন্ন ভাষার বহু পুরাতন লিপি খচিত আছে, সেই লিপিগুলিকে ঢাকা দেওয়া আছে কাঁচ দিয়ে, যাতে যাওয়া আসার পথে পা দিয়ে কেউ মাড়িয়ে না দেয়। এর মধ্যে সংস্কৃত, কন্নড়, তামিল, মারাঠি, মাড়োয়াড়ি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার লিপি আছে, যা কিনা ৬০০ খৃ. থেকে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত। ওই লিপিগুলিতে গঙ্গারাজ বংশ, হোয়সল প্রভৃতি রাজবংশের কথা লেখা আছে। আমরা শ্রদ্ধা জানাই বাহুবলী তথা গোমতেশ্বরকে।

হ্যালেবিদ

এখান থেকে হাসান (৫১ কিমি) হয়ে পৌঁছনো যায় হ্যালেবিদে, দূরত্ব ৭৮ কিলোমিটার। হ্যালেবিদে হোয়সল রাজারা ১১ শতকের প্রথম ভাগে স্থাপন করেছিলেন তাঁদের রাজধানী। তখন ওই জায়গার নাম ছিল দ্বারাসমুদ্র। অর্থাৎ সাগর থেকে প্রবেশ পথ। পরবর্তীকালে, ১৩১১ এবং ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাহমানী সুলতানরা দু-দুবার লুণ্ঠন করে ওই শহর এবং তারপর থেকে নাম হয় হ্যালেবিদ অর্থাৎ লুণ্ঠিত শহর। বর্তমানে শহরে দুটি মন্দির আছে, একটির নাম হোয়সলেশ্বর ও অপরটির নাম কেদারেশ্বর। ওই মন্দিরের স্থাপত্যকলাকে বলা হয় হিন্দু স্থাপত্যবিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, যা কিনা ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যার চরম উৎকর্ষতার প্রকাশ বলে মানা হয়।

আমরা এগিয়ে গেলাম হ্যালেবিদের হোয়সলেশ্বরের দিকে। মন্দিরের মঞ্চ বহু খাঁজে খাঁজকাটা আর তার সঙ্গে মানানসই মন্দিরগাত্রেও বহু ভাঁজ। যার ফলে মন্দিরের গায়ে আলোআঁধারির খেলা চলছে। জানা গেল ১১২১ খৃ. রাজা বিষ্ণুবর্ধনের মন্ত্রী কেটুমল্ল এই মন্দির স্থাপনার কাজ শুরু করেন এবং ১২০৭ খৃ. মন্দিরের নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। স্থাপত্যকলার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই মন্দির। উত্তর দিকের প্রবেশদ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলে দেখা যায় এক বর্গাকার মণ্ডপ, যার পশ্চিম দিকে একটি কক্ষ যেটি দেবস্থান। যার মধ্যে পূর্বদিকে মুখ করে একটি শিবলিঙ্গ রয়েছে। আর মণ্ডপের পূর্বদিকে দেবস্থানের সোজাসুজি একটি দরজা, যার বাইরে নন্দী মণ্ডপ। মণ্ডপের মধ্য দিয়ে সোজা দক্ষিণদিকে এগিয়ে গেলে আর একটি বর্গাকার মণ্ডপ যারও পশ্চিমদিকে শিবলিঙ্গ-সহ একটি দেবকক্ষ ও পূর্বদিকের দরজার বাইরে নন্দী মণ্ডপ। এই মণ্ডপ, দেবস্থান সবই এক মঞ্চের উপর এবং একই ছাদের তলায়। মণ্ডপদুটিকে একটি অলিন্দের সাহায্যে যোগ করা। মণ্ডপ এবং অলিন্দের ছাদকে ধরে রেখেছে সারিবদ্ধ ভাবে কালোপাথরের তৈরি বহু স্তম্ভ। প্রতিটি স্তম্ভের গঠনগত কারুকার্য আলাদা। স্তম্ভগুলি অন্তত ২৫-৩০ ইঞ্চি ব্যাস যুক্ত ও ১০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট। গোলস্তম্ভগুলিতে খাঁজকেটে কলশ ও চুড়ির কারুকার্য করা। অন্য স্তম্ভগুলি যেগুলি বহুভুজাকৃতি, সেগুলিতে পাথর কেটে অসাধারণ কাজ করা। প্রতিটি স্তম্ভই গঠনগত বৈচিত্র্যে এবং নকশার কাজে স্বতন্ত্র। প্রতিটি স্তম্ভই সুন্দর। শিবলিঙ্গ সমেত মন্দির দুটিকে বলা হয় যথাক্রমে হোয়সলেশ্বর ও শান্তলেশ্বর মন্দির। রাজা হোয়সলেশ্বর ও রানি শান্তালার নামে অভিহিত।

আস্তে আস্তে দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে বাইরে বেরলেই চোখে পড়ে সামনের বাগানে

হ্যালেবিদের প্রাচীন মন্দিরগাত্রে অপূর্ব কারুকার্য।

একটি মঞ্চের উপর রয়েছে ৮ ফুটের বিশাল গণেশমূর্তি। মন্দিরের চারিধারের দেওয়ালের গায়ে খচিত পাথরের কাজকর্ম দেখে শেষ করা যায় না। পাথরের তৈরি হাজারো মূর্তি দিয়ে সাজানো মন্দিরগাত্র। যার মধ্য দিয়ে যেমন রামায়ণ মহাভারতের কাহিনি, পুরাণের গল্পকথা উঠে এসেছে, তেমনি পশুপাখি, লতাপাতার কাজও রয়েছে। শিবের দরবার, শিশু কৃষ্ণের বাল্যকালের ঘটনাবলী, কর্ণ-অর্জুনের যুদ্ধ, কৃষ্ণের গোবর্ধন পর্বত তুলে ধরা, নৃত্যরত শিব, রাম-রাবণের কাহিনি এমন হাজারো ঘটনাবলী খচিত রয়েছে মন্দির গাত্রে। রয়েছে মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের উপরে অপূর্ব গজলক্ষ্মী প্যানেল। এরূপ ৩৫ হাজার বিস্ময় সৃষ্টিকারী পাথরের মূর্তিদ্বারা এই মন্দির সজ্জিত, যার প্রতিটি মূর্তিই আলাদা আলাদা ভাবে স্বতন্ত্র। কোনো মূর্তিই অপর মূর্তির প্রতিরূপ নয়। পূর্বদিকের নন্দী মণ্ডপ দু'টিও স্বতন্ত্র দুটি মঞ্চের উপর তৈরি। এখানেও ব্যবহৃত হয়েছে গোল করে কাটা কলস-চুড়ির কাজ সমেত কালো পাথরের স্তম্ভ। দু'টি মণ্ডপের মধ্যেই রয়েছে মহাদেবের বাহন নন্দী বা ষাঁড়ের বৃহৎ মূর্তি, যা উচ্চতায় ৭/৮ ফুট এবং লম্বায় ১০ ফুট। নন্দীর গায়ে পাথর কেটে কাজ করা, যে কাজ ৮৬ বছরেও সম্পূর্ণ হয়নি।

হোসলেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে কেদারেশ্বরের মন্দির। যা ১৩১৯ খৃ. রাজা বীরবালা (দ্বিতীয়) ও তাঁর ছোটরানি অভিনব কেতলদেবী, হোয়সলেশ্বর মন্দিরের আদলে বানিয়ে ছিলেন। এ মন্দিরের গায়েও রয়েছে পাথরের কাজ করা ১৮০টি দেবদেবীর মূর্তি। নিচের ভাগে মঞ্চের গায়ে রয়েছে হাতির দলের এগিয়ে যাওয়ার মূর্তি, ছুটন্ত ঘোড়ারপাল, সিংহ, পশু-পাখি প্রভৃতির পাথর দ্বারা তৈরি মূর্তির কাজ। মন্দির চত্বরের পাশেই রয়েছে মিউজিয়ম। যেখানে রাখা আছে হোয়সল আমলের পাথরের তৈরি ছোটবড় বহুমূর্তি, পাথরের কাজকরা বহু প্যানেল। প্রতিটি মূর্তিই স্বতন্ত্র, প্রতিটি মূর্তিই সুন্দর। রয়েছে জৈনমূর্তি, গণেশের বিভিন্ন মূর্তি, শিবের বাহন নন্দীর মূর্তি, ওই সময়কার সোনার মুদ্রা, ব্রোঞ্জের বিভিন্ন মূর্তি। এখান থেকে ৩ কিলোমিটার দূরে রয়েছে তিনটি জৈন মন্দির। একটি ১১৩৮ তৈরি আদিনাথেশ্বরের। একটি ছোট মন্দির শান্তিনাথের (১১৯২) এবং সবচেয়ে বড়টি পারশ্বনাথের। ১১৩৩ খৃ. গঙ্গারাজার ছেলে মন্ত্রী বোপ্পানা নির্মাণ করেছিলেন। এখানে ৪.২৪ মিটার উচ্চতার কালোপাথরের পারশ্বনাথের মূর্তি রয়েছে। সামনে নবরঙ মণ্ডপের ১২টি কালোপাথরের পালিশকরা, কলস-চুড়ির কাজ করা স্তম্ভ রয়েছে। পালিশ এতটাই উজ্জ্বল যে তাতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। বহির্ভাগের মণ্ডপেও রয়েছে বহু সুসজ্জিত স্তম্ভ।

বেলুড়

এখান থেকে বেলুড় ১৬ কিলোমিটার দূরে। ছোট্ট শহর যাকে ঘিরে রয়েছে 'যুগ্‌চি' নদী। পূর্বে এই শহরের নাম ছিল 'ভেল্লাপুরী'। দ্বারা সমুদ্রের রাজধানী দিল্লীর বাহমানী সুলতানদের হাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হবার পর হোয়সল রাজারা তাদের নতুন রাজধানী এই বেলুড়ে স্থাপন করেন। হোয়সল রাজবংশ দক্ষিণ ভারতে ১০২৬ থেকে ১৩৪৩ খৃ. পর্যন্ত রাজত্ব করেছে। এই সময়কালে বহু সুন্দর সুন্দর মন্দির দক্ষিণ ভারতে গড়ে তুলেছে। রাজা বিষ্ণুবর্ধন, তাঁর গুরু রামানুচার্যের প্রভাবে যখন জৈনধর্ম ছেড়ে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন, তখন তিনি বহু অনন্য সাধারণ মন্দিরের স্থাপনা করেন। তার মধ্যে অন্যতম এই 'চেন্নাকেশব' মন্দির, যা ১১১৬ খৃ. বেলুড়ে নির্মাণ করেন। তবে এই মন্দির সম্পূর্ণ হতে ১০৩ বছর সময় লেগেছিল। সেই সময় এই সব মন্দির শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে গড়ে উঠত না। মন্দির সামাজিক ন্যায় দানের স্থান, রাজস্ব ভাণ্ডার, নৈতিক শিক্ষাপ্রদান ও চারুকলা বিদ্যাশিক্ষার স্থান হিসেবেও ব্যবহৃত হোত।

চেন্নাকেশব মন্দিরের প্রবেশ মুখে রয়েছে দক্ষিণভারতীয় শিল্পকলায় তৈরি একটি বিশাল গেট। যাকে গোপুরম্ বলে। ভিতরে ঢুকলে মূল মন্দিরটি চোখে পড়ে। এই মন্দিরে বিষ্ণুর ২৪ অবতার রূপের মধ্যে 'বিজয়নারায়ণ' রূপের মূর্তিটি রয়েছে। মন্দিরের মূল মঞ্চ তারার মতো খাঁজকাটা, তেমনি মন্দিরগাত্রও ভাঁজ খেয়েছে মঞ্চের সঙ্গে তার মিলিয়ে। এখানেও মন্দিরগাত্র সাজানো হয়েছে পাথরের তৈরি অপূর্ব সুন্দর সব মূর্তি দিয়ে। যেমন রয়েছে হাতি, সিংহের মূর্তি তেমনি রয়েছে নৃত্যরত নারীমূর্তি। মন্দিরগাত্রের প্রতিটি খাঁজ, প্রতিটি জায়গা সাজানো হয়েছে এমনি বিভিন্ন ধরনের মূর্তির অলঙ্করণে। এদের মধ্যে অলংকারে সজ্জিত ৬৫০টি হাতির মূর্তি অন্যতম। মন্দির গাত্রে ধাপে ধাপে উপরিভাগে পাথরের কাজ করা যে কার্নিশ বেরিয়ে এসেছে, প্রতিটি কোণে যে ব্রাকেটের মাধ্যমে তাকে ধরে রেখেছে, তা এক একটি নৃত্যরত নারীমূর্তি। এরূপ ৪২টি নারীমূর্তি রয়েছে। প্রতিটি মূর্তি অসাধারণ কারুকার্য সমন্বিত অলংকার দ্বারা সুসজ্জিত, তাদের ধরে রেখেছে যে চালচিত্র তাও অপূর্ব সুন্দর কাজ দ্বারা সজ্জিত। প্রতিটি মূর্তি আলাদা আলাদা ভঙ্গিমায় আলাদা আলাদা ভাব প্রকাশ করছে। মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলে প্রথমেই নবরঙ মণ্ডপ। পাশে আলাদা করা দেবস্থানে রয়েছে ৩.৭ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট 'চেন্নাকেশবের' মূর্তি। চতুর্ভুজ মূর্তি, হাতে রয়েছে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম। দেবস্থান বা গর্ভগৃহ, নবরঙ মণ্ডপ ও দরজা থেকে অলিন্দ, পুরো অন্দর মহলের ছাদ রয়েছে কারুকার্য মণ্ডিত ৮৪টা সুন্দর স্তম্ভের উপর। প্রতিটি স্তম্ভই আলাদা আলাদা ভাবে সুন্দর ও স্বতন্ত্র। এদের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্বের একটি স্তম্ভের নাম নরসীমা স্তম্ভ, যা কিনা আগে ঘোরানো যেত, আর দক্ষিণ-পশ্চিমের মোহিনীস্তম্ভ এদের মধ্যে অন্যতম। মধ্যভাগের চারিটি স্তম্ভও আলাদা ভাবে উল্লেখযোগ্য এবং এই চারিটি স্তম্ভের উপরি ভাগে চারকোনার ব্রাকেট তৈরি হয়েছে চারিটি নৃত্যরত নারীমূর্তি দ্বারা। এই স্তম্ভগুলির মধ্যভাগের ছাদের সিলিং ধাপে ধাপে ঝাড়ের মতো নিচে নেমে এসেছে। অন্তিম ধাপ পাঁচমাথা শিবমূর্তিতে শেষ হয়েছে। এ মন্দিরের সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। একে দুচোখ ভরে দেখেও মন ভরে না, মনের মণিকোঠায় তুলে রাখতে হয়।

মায়ের মনে দুঃখ দিলে...

মটুকের বাবা গেঞ্জি কারখানায় কাজ করে। সেই সকালে বেরিয়ে রাতে ফেরে। মটুকরা চার ভাই-বোন। বড়দাদা তারপর দুই দিদি। মটুক সবার ছোট। দু'বছর হলো দাদা একটা মুদির দোকানে কাজ নিয়েছে। ওখানেই থাকে সে। বড়দিদি পড়া ছেড়ে দিয়েছে। সে এখন মায়ের সঙ্গে দোকানে রুটি তৈরি করে। ছোটদি আর মটুক কেবল স্কুলে যায়। মা সকালবেলা স্কুলে যাবার সময় দু-জনকে জামা পরিয়ে দেয়, চুল আঁচড়ে দেয়, তারপর ভাত মেখে লাড্ডু করে মুখের সামনে ধরে। সেগুলো খেয়ে দু'জনে স্কুলে ছোটে। মটুক পড়ে ক্লাস থ্রি-তে, ছোটদি ফোরে।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে মটুক দেখে বাবা তাড়াতাড়ি কাজ থেকে ফিরে এসেছে। মটুককে দেখে বলল— আজ কারখানায় নতুন মেশিন বসেছে, তার উদ্বোধন হবে। আমরা সবাই সেখানে যাব। মটুক আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। বলল— আমরা কি ট্রেনে করে যাবো বাবা? বাবা বলল— হ্যাঁ। মটুক কোনোদিন ট্রেনে চড়েনি। বাবার মুখে ট্রেনের গল্প শুনে খুব ইচ্ছে করতো ট্রেনে চড়তে, কিন্তু ওদের তো দূরে কোনো আত্মীয় নেই যে ট্রেনে করে যাবে। আজ সেই ইচ্ছে পূরণ হবে।

কিন্তু বাবা বললে কী হবে, মায়ের তো রুটির অর্ডার আছে। সেগুলো বানাতে এখনো অনেক দেরি। বাবা তখন বলল— ঠিক আছে, আমি মনু আর বনুকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা দু'জন পরে এসো। মায়ের উপর খুব রাগ হলো মটুকের। একদিন রুটি না বানালে হতো না? বাবা দিদিরা চলে গেল। তারপর বিকেলবেলা মায়ের রুটি বানানো হয়ে গেলে মটুকরা বেরোলো।

স্টেশনে এসে ট্রেন থামতেই মটুকরা উঠে পড়লো। জায়গাও পেয়ে গেল। ট্রেনে কত রকমের লোক! উল্টো দিকের সিটে ওর মতো আরো দু'জন ওদের বাবা মার সঙ্গে বসেছে। হকাররা সব হেঁকে হেঁকে যাচ্ছে। কত রকমের খেলনা তাদের কাছে। ম্যাজিক বই, বন্দুক আরো কত কী!

উল্টো দিকের ছেলে দুটোকে ওদের বাবা দু'টি বল কিনে দিল। বলের ভিতর লাল নীল বাতি জ্বলছে। মটুকেরও খুব ইচ্ছে করছিল ওরকম একটা বল কিনতে। কিন্তু মা কি কিনে দেবে? মায়ের দিকে সে তাকালো। মা বোধহয় বুঝতে পেরেছে, বলল— বাবার কাছে যাই, বাবা কিনে দেবে। মটুক কিছু বলল না।

কিছুক্ষণ পর একজন হকার উঠলো। দিলখুশ দিলখুশ হাঁকছে। বাবা একবার এনেছিল দারুণ খেতে। দিলখুশওলা কাছে আসতেই মটুকের খুব কিনতে ইচ্ছে করল। উল্টোদিকে বসা লোকেরা কিনলো। মটুকের দিকে ভুরু নাচিয়ে দিলখুশওলা বলল— কি খোকা দিলখুশ নেবে? মা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো— না না ও নেবে না। মটুকের ভীষণ রাগ হলো। বলল— আমি দিলখুশ খাবো। মটুকের মা বেশি পয়সা নিয়ে আসেনি। যা এনেছে ট্রেনের টিকিট কেটেছে। মা বলল— ফেরার সময় বাবা থাকবে তখন খাবি। মটুক জেদ করতে লাগলো— আমি দিলখুশ খাবো।

মা বলে— পয়সা নেই যে! উল্টোদিকের ছেলে দুটি ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খাচ্ছে। মটুক যেন ফেটে পড়লো। চেঁচিয়ে বলল— মা একটা দিশখুশ কিনে দিতে পারো না? শুনে মায়ে মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। কোনো কথা বলল না। ট্রেনের সবাই মা-ছেলেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। মটুক মুখ গোমড়া করে বসে রইলো। ট্রেনে মা আর কোনো কথা বলল না।

পরেরদিন স্কুলের বেলা হলো, কিন্তু মা তাকে জামা পরাতে এলো না। চুলও আঁচড়ে দিল না। কালকের কথা ভেবে মটুকের খুব কান্না পেল। কাল সত্যিই মায়ের কাছে কোনো টাকা ছিল না। ট্রেনের অত লোকের সামনে সে মাকে ওভাবে কথা বলেছে। মা খুব লজ্জা পেয়েছিল। মনে দুঃখ পেয়েছে। পরে ফেরার সময় বাবা তাকে খেলনা কিনে দিয়েছে। মাকে সে এভাবে দুঃখ না দিলেও পারতো। মা ওকে কত ভালোবাসে। মটুক ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

বারান্দায় মা রুটি বানাচ্ছিল। মটুকের কান্না শুনে ঘরে এসে বলল— কাঁদছিস কেন? আয় আমি তোকে জামা পরিয়ে দিচ্ছি। কাঁদতে কাঁদতে মাকে জড়িয়ে ধরে মটুক, বলল— আমি আর তোমাকে কখনো দুঃখ দেব না মা।

বিরাজ নারায়ণ রায়

রাজ্য পরিচিতি

মণিপুর

উত্তর-পূর্ব-ভারতের আর একটি ছোট রাজ্য মণিপুর। মণিপুরেও বিদেশি শক্তি কোনোদিন আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। নতুন রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি। আয়তন ২২ হাজার ৩২৭ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ২৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ৭৯৪ জন। রাজধানী ইম্ফল। ভাষা মণিপুরী। শিক্ষার হার ৮৯.৮৫। মণিপুরের মানুষ সাধারণত বৈষ্ণব। প্রধান কৃষিজাত ফসল ধান ও ভুট্টা। এখানকার বড় শিল্প হস্তচালিত তাঁত। বাঁশ ও বেঁতের কুটিরশিল্প এবং রেশমকীট পালনের দৃষ্টিতে মণিপুর ভারতের অগ্রগণ্য রাজ্য। ওক ও তসর শিল্প উল্লেখযোগ্য। এছাড়া চামড়া নির্মিত দ্রব্য, ভোজ্য তৈল উৎপাদন ও সূচীশিল্পেও মণিপুর সমৃদ্ধ।

ইম্ফলের রাধাগোবিন্দ মন্দির, বিষ্ণুপুরের বিষ্ণুমন্দির, পূর্ব ভারতের পানীয় জলের সবচেয়ে বড় ঝিল, ভাসমান উদ্যান বিশেষ পর্যটন কেন্দ্র। মণিপুরের রাসনৃত্য পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয়।

এসো সংস্কৃত শিখি

এষা মম সখে.....?

এ আমার বান্ধবী.....

ভবান কিম্ উদ্যোগং করোতি?

আপনি কী চাকুরি করেন? (পুং)

ভবতী কিম্ উদ্যোগং করোতি?

আপনি কী চাকুরি করেন? (স্ত্রী)

অহম্ এক: শিক্ষক:।

আমি একজন শিক্ষক।

অহম্ এক: শিক্ষিকা।

আমি একজন শিক্ষিকা।

ভালো কথা

পুরনো বই বিতরণ

উঁচু ক্লাসে উঠলে নীচু ক্লাসের সব বই পড়ে থাকে। সবাই সেগুলো বিক্রি করে দেয়। আমারও এমন অনেক বই ছিল। আমার দাদা-দিদিরও ছিল। মা সেগুলো বাক্সে ঢুকিয়ে রেখেছিল। কোনো কাজে লাগছিল না। এবার আমি সব বই বের করে নীচু ক্লাসের ছাত্রদেরকে দিয়ে দিয়েছি। নতুন ক্লাসে উঠলে সবাইকে অনেক বই কিনতে হয়। আমার বইগুলো এমনি এমনি পড়ে ছিল। আমি সেগুলো দিয়ে দেওয়াতে ওদের আর নতুন বই কিনতে হয়নি। আমি ঠিক করেছি এখন থেকে উঁচু ক্লাসে উঠলে আমার যে বইগুলো আর কাজে লাগবে না সেগুলোকে আমি অন্যকে দিয়ে দেব। **দীপাঞ্জন সাহা,** একাদশ শ্রেণী, কলকাতা-৭

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

দেশের শত্রু

সুমন্ত গরাই, নবম শ্রেণী, রামপুর, বাঁকুড়া

সন্ত্রাসবাদী যারা দেশের শত্রু তারা
লক্ষ্য তাদের শুধুই মানুষ মারা।
দেশের কত ভালো ছেলে
নয় কেউ এলেবেলে।
হয়ে ভুল আদর্শের ভক্ত
ঝরায় দেশের রক্ত,
দেশবাসী সব করুক পণ
যেন শত্রু না হয় আপন জন।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

প্রতিবাদিনী সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর

সুতপা বসাক ভড়

রাষ্ট্রীয় অনুসন্ধান এজেন্সি (এনআইএ) মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্ত সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরকে ক্লীনচিট্ দিয়ে দিয়েছে। এজেন্সির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, তাদের কাছে সাধ্বী এবং অন্য পাঁচ অভিযুক্তের বিস্ফোরণে শামিল হবার কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। অথচ গত সাড়ে সাত বছর ধরে বিনা সাক্ষ্য প্রমাণে তাঁকে কারাযন্ত্রণা এবং অসহ্য নির্যাতন সহ্য করতে হয়। বর্তমানে তিনি শারীরিক ভাবে ভীষণ অসুস্থ। সাধ্বীর একমাত্র দোষ হলো দেশ এবং হিন্দুত্বের প্রতি তাঁর তীব্র ভালোবাসা। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার তাঁকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করে কাল্পনিক 'গৈরিক সন্ত্রাস' ছড়ানোর অজুহাতে কোনোরকম চার্জশীট ছাড়াই জেলে বন্দি করে অকথ্য অত্যাচার চালায়।

সাধ্বীর জন্ম হয় মধ্যপ্রদেশের ভিন্দ-এ। পিতা চন্দ্রপাল সিং ছিলেন ভিন্দের একজন প্রথিতযশা আয়ুর্বেদ চিকিৎসক। তিনি রোগীদের প্রায়শই বিনামূল্যে চিকিৎসা করতেন এবং প্রাকৃতিক ওষুধেই তাদের অসুখ নিরাময় করতেন। তিনি ছিলেন একজন ধর্মভীরু মানুষ। ভগবদ্গীতা পাঠ ছিল তাঁর নিত্যকর্ম। ছোটবেলা থেকেই প্রজ্ঞা বাবার কাছে বসে গীতাপাঠ শুনতেন। ধীরে ধীরে তিনি হিন্দু দর্শন এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন এবং অল্প বয়সেই সাধ্বী হয়ে যান। বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে ভিন্দের লাহর কলেজ থেকে বি.এ. এবং ইতিহাসে এম.এ. পাশ করেন। এই সময় তিনি নিজে বাইক চালিয়ে ঘুরে ঘুরে মেয়েদের জন্য স্ব-রোজগার দল তৈরি করেন। মেয়েদের শিক্ষা এবং ক্ষমতায়নের পক্ষে তিনি জনসমক্ষে বক্তব্য রাখতে থাকেন। শীঘ্রই ওই এলাকায় তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। দুর্গাবাহিনীর সদস্যা ছিলেন। আধ্যাত্মিক এবং হিন্দু সাহিত্যের জ্ঞানসমৃদ্ধ ছিল তাঁর ওজস্বী ভাষণ। কলেজে পড়ার সময় তিনি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদে যোগদান করেন এবং শীঘ্রই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জনপ্রিয় নেত্রী হয়ে ওঠেন। তাঁর বক্তব্য ছিল দেশপ্রেমে পরিপূর্ণ। দেশবিরোধী কার্যকলাপ তিনি ভীষণ ঘৃণা করতেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-য়ের আমলে উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ প্রসঙ্গে বার বার তিনি হিন্দুদের সঙ্ঘবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। তিনি কংগ্রেসের কার্যনীতির বিরোধী ছিলেন। সব মিলিয়ে জনপ্রিয় এই যুবনেত্রী কংগ্রেসের কুনজরে পড়েন এবং তাঁদের মনগড়া ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে দীর্ঘসময় জেল খাটতে বাধ্য হন।

এটিএস ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৮-এ মালেগাঁও-য়ের ভিক্কু চৌকে বিস্ফোরণের জন্য প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর এবং আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। এটিএস-এর পক্ষ থেকে তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়। প্রথমে দু'জন পুরুষ পুলিশ চামড়ার বেল্ট দিয়ে তাঁকে মারেন। চব্বিশ ঘণ্টা তাঁকে কোনো খাবার দেওয়া হয়নি। তাঁকে ধমকানো হয়েছে, তিনি যেন মালেগাঁও বিস্ফোরণে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। প্রজ্ঞাও তাদের বারবার জানিয়েছেন যে নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু তাঁর কোনো কথাই ওই সময় এটিএস কর্তৃপক্ষ শোনেনি। একাধিক পুরুষের উপস্থিতিতে সাধ্বীকে ব্লু-ফিল্ম দেখতে বাধ্য করা হয়। এত কিছু সত্ত্বেও এটিএস তাঁকে দিয়ে মিথ্যা কিছু লিখিয়ে নিতে পারেনি। এটিএস-এর উচ্চপদস্থ কর্মীরা তাঁকে 'বেশ্যা' অপবাদ দিতেও ইতস্তত করেনি। তাঁর ব্যবহৃত বাইক ঘটনাস্থলে পাওয়া গেছে— এই অজুহাতে তাঁর ওপর শারীরিক- মানসিক অত্যাচার করা হয়, অথচ ওই ঘটনার কয়েক বছর আগেই প্রজ্ঞা ওই বাইক বিক্রি করেছেন এবং সেই সংক্রান্ত নথিপত্রও এটিএস-কে দেখান।

স্বাধীন ভারতের নাগরিক সাধ্বী প্রজ্ঞা। পরাধীন ভারতে দেশপ্রেমের জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা অনেক অত্যাচার সহ্য করেছেন। কিন্তু স্বাধীন ভারতেও দেশের কাজের জন্য অত্যাচার ভাবা যায় না। এটিএস-এর উচ্চপদস্থ কার্যকর্তারা সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের ওপর অত্যাচার করে তাঁর মেরুদণ্ড এমনভাবে নষ্ট করে দিয়েছে যে, তিনি হেঁটে শৌচালয়ে পর্যন্ত যেতে পারেন না। স্তন-ক্যান্সারের তৃতীয় পর্যায়ে আজ তিনি আক্রান্ত। ডাক্তারদের মতে অপারেশন, ফিজিওথেরাপি এবং অন্যান্য চিকিৎসা ঠিকঠাক হলে হয়তো ভবিষ্যতে তিনি আবার সুস্থ হয়ে উঠতে পারবেন; অথচ তাঁর পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন যে দীর্ঘ কারাবাসে তাঁদের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও কারা-কর্তৃপক্ষ তাঁর চিকিৎসার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়নি। প্রজ্ঞার মতো দৃঢ় শারীরিক এবং মানসিক শক্তির মহিলাকে ষড়যন্ত্রকারীরা দীর্ঘকালীন অসুস্থ করে দিয়েছে।

মালেগাঁও মামলার সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের বিরুদ্ধে সব মামলা ফেরত নেওয়ার সিদ্ধান্তকে দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, যেসব ব্যক্তি পরিকল্পিতভাবে সাধ্বীকে ফাঁসিয়েছে, তাদের বিচার হওয়া উচিত। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কার্যকর্তা ইন্দ্রেশকুমারজী তৎকালীন সরকারকেই এর জন্য দায়ী করেছেন। মীনাক্ষী লেখী বলেছেন যে, প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী গতিবিধিতে শামিল হবার কোনো উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ ছিল না। হিন্দু সমাজকে অপমান করা ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিছু স্বার্থান্বেষী লোক 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদী' তকমা দিয়ে সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের মতো একজন দেশপ্রেমী, প্রতিভাশালী, সম্ভাবনাময়ী মেয়ের জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। ▮

গান্ধী পরিবারের বিভিন্ন কালপর্বের শাসনে দেশ বাড়তি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছে

অতিথি কলম

কৃষ্ণমূর্তি সুব্রহ্মনিয়ম

উত্তর প্রদেশের আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনী লড়াইয়ে পরিবারতন্ত্র তাদের পাশার শেষ ঘুঁটি অর্থাৎ প্রিয়ঙ্কা গান্ধীকে শেষ ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এখন উত্তরপ্রদেশের নির্বাচকমণ্ডলী স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন তুলতেই পারে ইউপিএ সরকারের শাসনকালে প্রিয়াঙ্কাদেবীর স্বামী রবার্ট বডরা যে সমস্ত সন্দেহজনক ব্যবসায়িক লেনদেনের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে ফেলেছিলেন, যার মধ্যে অনেক লেনদেনই এখন তদন্তের আওতায় চলে গেছে। এর পর যদি ধরে নেওয়া যায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধী নির্বাচন জিতে ক্ষমতায় চলে এলেন সে ক্ষেত্রে কি রবার্ট বডরা পাকিস্তানের বেনজির ভুট্টোর স্বামী আসিক আলি জারদারির মতো যিনি যে কোনো সরকারি বেসরকারি বড় লেনদেন হলেই শতকরা ১০ টাকা কমিশন

> **“একটি চিন্তাজনক বিষয় হলো পারিবারিক শাসনের আওতায় দেশের অর্থনীতির ঋণভার অ-পারিবারিক শাসনের অপেক্ষা সব সময় বেড়ে চলত। তথ্য অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক দেনা ও নগদ ঘাটতির পরিমাণ পারিবারিক শাসনের সময় অ-পারিবারিক শাসনের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি ছিল।”**

মেনে অভ্যস্ত থাকায় দেশ-বিদেশে ‘মিঃ ১০ শতাংশ’ নামে কুখ্যাত হয়েছিলেন, তাকে অনুসরণ করবেন? কিন্তু এরকম একটি সম্ভাব্যতার প্রশ্ন বাদ দিলেও আমরা দেখতে চাই দীর্ঘকাল এই পরিবারের কাছে তাদের অবিমিশ্র আনুগত্য বাঁধা রেখে দেশ ও দেশবাসী পরিবারের কাছ থেকে প্রতিদানে কী পেল? এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন। প্রশ্নটি উঠছে কেননা পরিবারতন্ত্র দেশের শাসনভার ও ক্ষমতাভোগ করার অধিকার নিজেদের হাতেই রাখতে চাওয়ার কারণেই প্রিয়াঙ্কাকে শেষ বাজি হিসেবে লাগাতে চায়। তাই এই পারিবারিক শাসনকে কায়েম রাখতে আগে এ প্রশ্ন আসতেই পারে এই দীর্ঘ পরিবারতন্ত্রের উত্তরাধিকার কী?

আমরা এখানে বিভিন্ন অর্থনৈতিক মানদণ্ড ও সূচকের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখাব এই শাসনকে আদৌ প্রশংসার যোগ্য বলা যায় না। এই শাসনপর্ব মূলত দেশের টাকা দান খয়রাত করে সস্তা জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখারই ইতিহাস। তাতে দেশের অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে গেলেও পরিবারের কিছু আসে যায় না। শাসনপ্রণালী বিশ্লেষণ করলে প্রকাশ্যে যে সংখ্যাতত্ত্ব উঠে আসে তার সারাংশ একটিই : দেশের অর্থনীতিতে ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়লেও ভরতুকির পাহাড় তৈরি করে যাও।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের তরফ থেকে আমরা এই সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান নিয়ে এসে বিশ্লেষণ করেছি। পরিবারতন্ত্র চালু থাকা শাসনকালে ও অ-পারিবারতান্ত্রিক শাসনের সময় অর্থনীতির গতিপ্রকৃতিতে তার কী তুলনামূলক প্রভাব পড়েছিল এটিই ছিল আমাদের বিবেচ্য। এই বিচারক্ষেত্রে ইউপিএ-১ ও ইউপিএ-২ যা মনমোহন সিং-য়ের নেতৃত্বে হলেও এটি সর্বজ্ঞাত যে জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ (National Advisory Council) সংস্থার মাধ্যমে সোনিয়া গান্ধীই এই সরকারের নিয়ামক ছিলেন। তাই এই দুটি সরকারও পরিবারতন্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এরই বিপরীতে পিভি নরসিংহ রাও যাঁকে কংগ্রেস দল তার হিসেবের মধ্যে গণ্যই করত না এবং প্রায় নির্বাসনেই পাঠিয়ে দিয়েছিল, পাকচক্রে তাঁর শাসনকালেই দেশে প্রথম অর্থনৈতিক সংস্কারের কাজ শুরু হয়। তাই এই সরকারটিকে আমরা পরিবারতন্ত্রের সরকার আখ্যা দেব না।

অবশ্য রাজীব গান্ধী দেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শ্যাম পিত্রোদার হাত ধরে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার সূচনা করলেও তা পারিবারিক শাসন পরিধির মধ্যেই ছিল। আর ইন্দিরা গান্ধী যিনি ‘গরিবি হটাও’-এর স্লোগান দিয়েছিলেন তাঁর আমলে গরিবি বিপুল হারে বৃদ্ধি পায়। তিনি এই পরিবারতন্ত্রের মহাগুরুত্বপূর্ণ কারিগর।

নানান স্তরের বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে আমরা একটা জিনিস ঘুরে ফিরে আসতে দেখেছি তা হলো ভরতুকির বিশাল ঐরাবত। এই পরিসংখ্যানটি দেখুন। পারিবারিক শাসন প্রতি বছর ভরতুকি ও অন্যান্য খয়রাতির মাধ্যমে বছরে যেখানে ৬ লক্ষ ৮৯ হাজার ৬শো কোটি টাকা খরচ করেছে সেখানে অ-পারিবারিক শাসনের সরকার বছরে ১ লক্ষ ৮৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে মাত্র। কিন্তু এ প্রসঙ্গে এটা মনে করার কোনো অবকাশই নেই যে পরিবারতন্ত্রের সময় দেশের কোষাগারে

ফঃ ৪

পর্যাপ্ত অর্থ সঞ্চিত ছিল এবং তা থেকেই টাকা বিলিয়ে দেওয়া হোত। জিডিপি'র ৯.২ শতাংশ ভরতুকি বাবদ পরিবারতন্ত্রের শাসনপর্বে খরচ হয়েছিল, তুলনায় অ-পারিবারিক জমানায় ভরতুকির পরিমাণ ছিল মাত্র ৫.৩ শতাংশ। দেখা গেছে পারিবারিক শাসনের সময় প্রতি বছর ভরতুকির বৃদ্ধি ঘটেছিল ১৩ শতাংশ হারে, যেখানে দুই রাজত্বের মধ্যে তফাত হয়তো অতটা নজরে পড়ার মত নয়। তবু তা অবশ্যই ছিল। পরিবারতন্ত্র তার খেয়ালখুশি মতো খরচের বহর বাড়িয়ে চলত। যেমন মোট জিডিপি-র গড়পড়তা ১৫.৬ শতাংশ তারা যখন খরচ করতো সেই তুলনায় অ-পারিবারিক শাসনে এই খরচ ছিল ১৪.৮ শতাংশ। কম তো বটেই। এছাড়া পরিবারতন্ত্রের সময় মোট সময় মোট খরচের বৃদ্ধি ঘটত ৯.১ শতাংশ হারে এবং অন্য শাসনে এই হার ছিল ৫.৬ শতাংশ।

আরও একটি চিন্তাজনক বিষয় হলো পারিবারিক শাসনের আওতায় দেশের অর্থনীতির ঋণভার অ-পারিবারিক শাসনের অপেক্ষা সব সময় বেড়ে চলত। তথ্য অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক দেনা ও নগদ ঘাটতির পরিমাণ পারিবারিক শাসনের সময় অ-পারিবারিক শাসনের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি ছিল। বিশেষ করে নগদের ঘাটতি বেশি থাকার অর্থ এ থেকে মূলধনী খরচের ক্ষেত্রে যেমন ভবিষ্যতে রির্টানের আশা করা যায় এক্ষেত্রে সে আশা থাকে না।

অন্যদিকে দেনার দায় চোকানোর (কিস্তি মেটানোর) ক্ষেত্রেও পারিবারিক শাসন মোট জাতীয় আয়ের ১.৬ শতাংশ ব্যয় করত। যেখানে অ-পারিবারিক শাসনের ক্ষেত্রে এই গঠনমূলক খরচ (কেননা দেনাটা বেশি কমছে) ছিল জাতীয় আয়ের ২.৬ শতাংশ যা অনেকটাই বেশি। এ থেকে একটা জিনিস ভয়াবহভাবে উঠে আসছে পরিবারতন্ত্র দু' হাতে খয়রাতি দিয়ে গেছে, অর্থভাণ্ডারের যথেচ্ছ অবব্যয় করেছে, সেইসঙ্গে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও অন্যান্য দেনার দায়ে জড়িয়ে দিয়ে গেছে।

এখানে আরও একটি একের সঙ্গে এক জড়িত থাকার জঘন্য খেলা রয়েছে। সে সময় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়ার ব্যবস্থা না করায় যত বেশি ভরতুকি যাদের উদ্দেশে ছাড়া হোত সেখানে পৌঁছবার আগে ভরতুকিকে অনেক নদী-নালা পেরোতে হোত যাতে ওত পেতে থাকতো হাঙ্গর, কুমির যারা ভাসমান ভরতুকিকে যাত্রাপথেই শিকার করত, খুব কমই যেত সঠিক উপভোক্তার কাছে। কু-প্রভাব হিসেবে এই ভরতুকি রাজত্বের ফলে দেশে কোনো স্থায়ী সম্পদ তৈরি হোত না, সঙ্গে মানুষের কাজ করার অনুপ্রেরণাও নষ্ট হয়ে যেত। দেখা যাচ্ছে দেশের কোষাগার যথেচ্ছ বিলিয়ে দিয়ে দেশের অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলা ছাড়াও দেশকে ঋণভারে জর্জরিত করাই পারিবারিক শাসনের একমাত্র অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার। তাই উত্তর প্রদেশের ভোটারদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে বড় বড় কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে কিছু দান খয়রাত করে দিলেই তাদের 'নকরি, পয়সা ও মকানের' দাবির কোনো সুরাহা হবে না। বরং তাদের মনে রাখা উচিত প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর ঠাকুমার 'গরিবি হটাও' ডাক ছাড়ার কথা যা দেশবাসীর খুব অন্তরের কাছাকাছি চলে গিয়েছিল, সেই স্লোগান-বৃক্ষের ফল ছিল কিন্তু শূন্য। ■

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬

দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

সন্ত্রাসবাদের যমজ-স্তম্ভ আল কায়দা ও আই এস

মহম্মদ বাজ্জি

২০১১ সালের মে মাসে পাকিস্তানের অ্যাবেটাবাদে মার্কিন বিশেষ বাহিনী ওসামা বিন লাদেনের গোপন আস্তানায় হামলা চালায়। মার্কিন রাষ্ট্র-প্রধান বারাক ওবামা প্রশাসনের নিঃসন্দেহে এটি একটি বিপুল সাফল্য। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আল কায়দা শেষ হয়ে গিয়েছে।

আজ, ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যুর পাঁচ বছর বাদে ইসলামিক স্টেট (আই এস) বহুভাবে আল কায়দার ছায়াপাত ঘটিয়ে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জঙ্গি-সতর্কতা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পাশ্চাত্যের নিরাপত্তা আধিকারিকেরা এখন আই এস-কে তাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বৃহত্তর বিপদ হিসেবে দেখছে। বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় আই এস-এর প্রভাব এবং এর বিভিন্ন পদে হাজার হাজার মোহমুক্ত করা মুসলিম যুবকদের নিয়োগের জন্য। এফ বি আই (ফেডেরাল ব্যুরো অব্ ইনভেস্টিগেশন)-এর নির্দেশক জেমস কমে গত গ্রীষ্মে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে বলেছেন যে আই এস 'তোমার অভিভাবক আল কায়দা নয়'।

গত ১২ জুন ফ্লোরিডার ওরল্যান্ডো-তে একটি পুরুষ-সমকামী নৈশ-ক্লাবে এক বন্দুকধারী গুলি চালিয়ে ৫০ জনকে হত্যা ও ৫৩ জনকে আহত করে। এই হত্যালীলা চলাকালীন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তিন ঘণ্টা অকেজো করে রাখার সময়ই সেই বন্দুকধারী ওমর মতিন পুলিশকে ডাকে এবং আই এসের সঙ্গে তার যোগাযোগের বিষয়টি ঘোষণা করে। ঘটনার পরের দিন আই এস গোষ্ঠীও এর পেছনে তাদের দায় স্বীকার করে

লাদেন

বাগদাদি

নেয় এবং দাবি করে মতিন 'আমেরিকাতে খলিফতের এক অন্যতম সৈনিক'।

যদিও মার্কিন আধিকারিকরা সতর্ক দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করছেন যে আধুনিক আমেরিকার ইতিহাসে জঘন্যতম গণহত্যা সংঘটিত করতে মতিন আই এসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল কিনা, কারণ এখনও অবধি আই এস গোষ্ঠীর সঙ্গে তার সরাসরি যোগের

জওয়াহিরি

কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সুতরাং সে এদের দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়ে না এদের সন্ত্রাস -পরিকল্পনাকারীদের বুদ্ধিতে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে পশ্চিমে 'একক নেকড়ে' আক্রমণের তত্ত্বে, বিশেষ করে পবিত্রমাস রমজানের সময়, এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল।

সন্ত্রাসী অর্থনীতির প্রতিযোগিতা :

২০১৩ থেকে আই এস এবং আল কায়দা তহবিল, জেহাদি জোগাড় ও সম্মানের প্রশ্নে পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এমনকী কৌশলের প্রশ্নেও প্রায়শই তাদের মধ্যে বিতর্ক দানা বাধে। আই এস নেতৃত্ব নিরীহ নাগরিকদের গণহারে হত্যায় বিশ্বাসী। যার মূর্তরূপ প্রকাশ পেয়েছে প্যারিস, বাগদাদ, বেইরুট-সহ অন্যত্র সাম্প্রতিক জঙ্গিহানায়।

২০১৪-র শেষে আই এস সিরিয়া ও ইরাকের একটা বড় ভূখণ্ড দখল করে নেয়। তারা ঘোষণা করে এই দখলিকৃত ভূখণ্ড খলিফার রাজ্য এবং খলিফা হিসেবে তাদের নেতা আবু বকর আল বাগদাদি 'বিশ্বের সমস্ত মুসলমানদেরও নেতা' ও তিনিই এই রাজ্য শাসন করবেন।

আই এস একটি স্থানীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল যারা তাদের এলাকা শাসন, হাজার হাজার জেহাদিকে প্রশিক্ষণ এবং তেল ও অন্যান্য উৎসের অবৈধ বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রভূত অর্থ উপার্জনের

মতো বিষয়গুলিকে মেনে নেবে। এবং এই সব বিষয়গুলিই কিন্তু আল কায়দা যে স্তরে পৌঁছতে পেরেছিল আই এস তার থেকে অনেক উঁচু স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। আইএস একইসঙ্গে জেহাদি জোটানোর ক্ষেত্রে বৃহত্তর প্রয়াস নিয়েছে এবং আল কায়দার তুলনায় সোশ্যাল মিডিয়াতে তাদের উপস্থিতিও অনেক আধুনিকতম।

তাদের স্ব-ঘোষিত খলিফার রাজ্যে অধিকতর উৎসের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে এবং আল কায়দার থেকে রোজগার আরও বাড়াতে সক্ষম হয়েছে আই এস। আই এস তেল ও গম বেচে, তাদের আয়ত্তাধীন এলাকার অধিবাসীদের ওপর কর চাপিয়ে এবং তোলাবাজির মাধ্যমে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছে।

মার্কিন কোষাগার দপ্তরের এক হিসেব বলছে ২০১৪-য় আই এস ২ বিলিয়ন ডলার টাকা তুলতে পেরেছে। এর মধ্যে কালো বাজারে তেল বিক্রয়ের ৫৫০ মিলিয়ন ডলার যেমন রয়েছে, তেমনি সিরিয়া ও ইরাকে প্রাথমিক পদক্ষেপের মুহূর্তে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে ডাকাতি করা ১ বিলিয়ন ডলারও রয়েছে। অন্যদিকে এর বিপরীতে আল কায়দা ইতিহাসগতভাবেই ভরসা রাখতো ধনী ব্যক্তিদের বিশেষ করে আরব দুনিয়ার অনুদানের ওপরই।

সব মিলিয়ে আন্তর্জাতিক জেহাদিপন্থায় নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে আই এস একপ্রকার উচ্ছেদ করেছে আল-কায়দাকে। কিন্তু এর দুর্বলতর অবস্থা সত্ত্বেও আল কায়দা এখনও পশ্চিম, পশ্চিম এশিয়া এবং প্রশস্ততর মুসলিম দুনিয়ার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক শক্তি। ইদানীংকালে ইয়েমেনে আরও সক্রিয় হয়ে উঠছে ওই জঙ্গিগোষ্ঠী। এবং এদের অনুমোদিত সিরিয়ার জাবহাত আলনুসরা জঙ্গি সংগঠনটি সিরীয় রাষ্ট্রনায়ক বাশার-আল-আসাদের জমানায় জেহাদি জঙ্গিদের মধ্যে ভালো প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে।

আল কায়দা'র স্বর্ণযুগে :

এটা খুব জরুরি নয় যে আলকায়দা'র সন্ত্রাসের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের ক্ষমতাকে, যেটা তারা আগে দেখিয়েছিল, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তাকে গুরুত্ব না দেওয়া। ২০০১ সালের অক্টোবরে যখন মার্কিন সেনা আফগানিস্তানে প্রবেশ করে ওসামা বিন লাদেন ও তার সমর্থকদের আশ্রয়দাতা তৎকালীন শাসক তালিবানদের দেশছাড়া করতে, সাময়িকভাবে আল কায়দার ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। যদিও দ্রুত সামলে নেওয়া হয়, জীবিত সদস্যদের ছত্রভঙ্গ করে বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়, ইন্টারনেটের মাধ্যমে আরও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে এদের আদর্শগত বয়ান ও জঙ্গি কৌশল পৌঁছে দেওয়া হয় এবং সর্বোপরি আল-কায়দার ব্যানারের তলায় স্বশাসিতভাবে কাজ করতে নতুন জঙ্গি-নিয়োগকেও উৎসাহিত করা হয়।

এমনকী যখন লুকিয়ে ছিল তখনও ওসামা বিন লাদেন ও তার শীর্ষ লেফট্যানেন্ট আয়মান আল জওয়াহিরি ডজন ডজন ভিডিও, অডিওটেপ এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে খোলাখুলিভাবে জঙ্গিপনার বার্তা পাঠিয়ে দিত তাদের অনুগামীদের কাছে। এদের প্ররোচনায় ইরাক, সৌদি আরব, মিশর, জর্ডন, মরক্কো, স্পেন, তুরস্ক এবং বৃটেনে হাজার হাজার যুবক আত্মঘাতী বোমা হিসেবে কাজ করেছে কিংবা প্রথাগত বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

বিন লাদেন এবং জওয়াহিরি পাক-আফগান সীমান্তের পার্বত্য এলাকায় নিজেদের গোপন রাখতে ভরসা পেত। পাসতুন জনজাতির ছত্রছায়ায়। তারা এলাকাটিকে অত্যন্ত ভালোভাবে চিনতো, ১৯৮০-র দশকে সি আই এ (সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি)-র আর্থিক সমর্থিত সোভিয়েত-অধিগৃহীত আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে জেহাদি লড়াইয়ের সৌজন্যে। কিন্তু এই বিন লাদেনের খোঁজ পাওয়া গেল এবং হত্যাও করা হলো পাকিস্তানের এমন একটি শহরে, যেটি রাজধানী ইসলামাবাদের উত্তরে অবস্থিত, ইসলামাবাদ থেকে গাড়িতে যেতে ঘণ্টাখানেক লাগে। লাদেনের মৃত্যুর পর পাক-নেতারা কখনোই এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেনি যে তাদের নজর এড়িয়ে ওসামা কীভাবে সেদেশে রইলো এবং উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের জনজাতি-অধ্যুষিত এলাকাতেই বা কীভাবে আল-কায়দা তার সাংগঠনিক কাঠামো ফের মজবুত করতে পারলো।

৯/১১ হামলার আগে, লাদেন আফগান শিবিরে নিয়োগকারীদের প্রশিক্ষণে আস্থা রাখতো এবং অনেক জঙ্গি ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে গোপনীয়তা রক্ষার শপথও নিয়েছিল। কিন্তু যখন তার লুকিয়ে থাকার জীবন শুরু হলো, তখন সে হয়ে উঠলো একটা প্রতীকের থেকেও বড়ো এবং নির্দিষ্ট আক্রমণের ষড়যন্ত্রীর থেকেও আদর্শের উৎস হিসাবে তার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। আফগানিস্তানে লাদেনের এক প্রাক্তন দেহরক্ষী আরবি সংবাদপত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তাদের দলের অপরেশনের বর্ণনা করেছিল এইভাবে— 'আল কায়দার প্রত্যেকটি বস্তু স্বয়ংক্রিয়। যদি কেউ দেখতো হামলার সুযোগ আছে, তবে সে তাই করতো'। এই সিদ্ধান্ত তাদের একার।

'কাছের' ও 'দূরের' শত্রু :

অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও আই এস এবং আল কায়দার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শেষোক্ত জঙ্গি-সংগঠনটি উৎপাটিত করতে চায় 'কাছের শত্রু'কে। তাদের দৃষ্টিতে এই 'কাছের শত্রু' হলো পশ্চিম এশিয়ার দুর্নীতিপরায়ণ এবং 'স্বধর্মচ্যুত' জনগণ। কিন্তু এটা করার পাশাপাশি আল কায়দা নেতৃত্বের চোখ 'দূরের শত্রু'দের দিকে— সেটা হলো আমেরিকা ও অন্যান্য পশ্চিমি দেশ।

অবশ্য এই লক্ষ্যের মূলে রয়েছে বিদেশে মার্কিন-সক্রিয়তা, দশকের পর দশক ধরে ওয়াশিংটন মিশর কিংবা সৌদি আরবের মতো দেশের অবদমিত অঞ্চলগুলিকে সমর্থন করে গিয়েছে। যে দেশগুলি ছিল আদতে আল কায়েদার আঁতুড়ঘর। একজন সৌদি হিসেবে লাদেন কিংবা তার উত্তরাধিকার মিশরীয় জওয়াহিরি দু'জনেই প্রথম তাদের দেশের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে গেল। তখন এদের উপলব্ধি হলো যে আমেরিকা এই অঞ্চলগুলির অবলম্বনে সহায়ক হচ্ছে। তাই 'দূরের শত্রু' হিসেবে বিবেচিত হলো আমেরিকা। আমরা কোনোদিনই হয়তো জানবো না যে এই লোকগুলি আদৌ কোনোদিনই আমেরিকাকে

আক্রমণ করতো কিনা, যদি না আমেরিকা সেই সরকারগুলিকে সমর্থন করতো। যে সরকারগুলো ধ্বংসের চেষ্টা এরা করেছিল। কিন্তু আমেরিকা কখনোই এ ব্যাপারে সাহায্য করেনি।

আল কায়দার বিশ্বাস আমেরিকাকে ক্রমাগত আক্রমণ করলে বিষয়টি ঘটনাচক্রে ওয়াশিংটনকে বাধ্য করবে স্বয়ংশাসিত আরব দুনিয়া থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে এবং গোটা পশ্চিম এশিয়াকে ত্যাগ করতে। কিন্তু আল কায়দার এই তত্ত্বের সঙ্গে আই এস মোটেও সহমত নয় এবং এর পরিবর্তে তাদের মূল লক্ষ্য অবশ্যই 'কাছের শত্রু'রা। অর্থাৎ সিরিয়া, ইরাক-সহ আরব দুনিয়ার অন্যান্য তথাকথিত 'স্বধর্মচ্যুত' অঞ্চল। এখনও পর্যন্ত, আই এস তার এই কৌশলে সবচেয়ে বেশি সাফল্য পেয়েছে বিশেষ করে ভূখণ্ড দখল ও সেখানে শাসন-তন্ত্র কায়েমের নিরিখে।

আল কায়দার বিশ্বাস আমেরিকাকে ক্রমাগত আক্রমণ করলে বিষয়টি ঘটনাচক্রে ওয়াশিংটনকে বাধ্য করবে স্বয়ংশাসিত আরব দুনিয়া থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিতে এবং গোটা পশ্চিম এশিয়াকে ত্যাগ করতে। কিন্তু আল কায়দার এই তত্ত্বের সঙ্গে আই এস মোটেও সহমত নয় এবং এর পরিবর্তে তাদের মূল লক্ষ্য অবশ্যই 'কাছের শত্রু'রা। অর্থাৎ সিরিয়া, ইরাক-সহ আরব দুনিয়ার অন্যান্য তথাকথিত 'স্বধর্মচ্যুত' অঞ্চল।

'দূরের শত্রু'দের দিকে মনোযোগ দিতে লাদেনকে প্রভাবিত করেছিল জওয়াহিরি-ই। ৯/১১-র আক্রমণের অনুপ্রেরণাও সেই যুগিয়েছিল। ১৯৮০-র দশকে জওয়াহিরি মিশর থেকে বিতাড়িত হয়। একটি বে-আইনি জঙ্গি গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ-সাজশের জন্য তার আগে বছর তিনেক জেল খাটতে হয়েছিল তাকে। দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে সে সুদান, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে কিছুদিন কাটায়। ১৯৮৭ সালে পাকিস্তানে লাদেনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেই সময় ওসামা বিন লাদেন, একজন কোটিপতি সৌদি ভিন্ন মতাবলম্বী, যে 'আফগান আরব'-এর ক্যাডার তৈরিতে প্রশিক্ষণ ও অর্থের জোগান দিচ্ছে। এর ফলে তখন সোভিয়েত অধিগৃহীত আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য পশ্চিম এশিয়া জুড়ে ইসলামি স্বেচ্ছাসেবক তৈরির প্রক্রিয়া চলছিল, যাদের হাতে পরবর্তীকালে সূচনা হয় ওসামা বিন লাদেনের নেটওয়ার্কের।

১৯৮০-র দশকের শেষে জওয়াহিরি পাক-শহর পেশোয়ারে একটি কার্যালয় স্থাপন করে। এই শহরটি আফগান-সীমান্তের খুব কাছে এবং এটিকে প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল এবং আফগান-প্রতিরোধের ব্যাপারে সংযোগ-রক্ষার মাধ্যম রূপেও ব্যবহৃত হয়। এটা হচ্ছে সেই পেশোয়ার যেখানে জওয়াহিরি লাদেনের সঙ্গে তার সম্পর্ক দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করার চেষ্টা করে। এবং জঙ্গি-ইসলাম সম্পর্কে সৌদিদের ভাবনা-চিন্তাকে পুর্ণরূপ দেওয়ার জন্যও সচেষ্ট হয় সে। জওয়াহিরির সাহায্যেই ওসামা বিন লাদেন আফগান-প্রতিশোধের আর্থিক-সহায়তাকারী থেকে জেহাদি আদর্শে দৃঢ় বিশ্বাসীতে পরিণত হয়, যে ইসলামের প্রত্যক্ষ গোচরীভুক্ত শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইতে এগিয়ে যায়।

আল কায়দা যেহেতু অনেকটা নিষ্প্রভ হয়েছে, তাই নতুন সাম্রাজ্য বিস্তারের মধ্যে দিয়ে তার শূন্যস্থান পূরণ করতে সচেষ্ট হয়েছে আই এস। ২০১৪-র নভেম্বরে বাগদাদি ঘোষণা করে আই এস তার স্বঘোষিত 'খলিফার রাজ্যে'র মধ্যে নতুন পাঁচটি 'প্রদেশ' (প্রভিন্স) গঠন করেছে। যথা : সৌদি আরব, ইয়েমেন, লিবিয়া, আলজিরিয়া ও মিশর। যখন আই এসের প্রতি সহানুভূতিশীলেরা বাগদাদিকে এই দেশগুলি ছাড়া অন্যান্য রাষ্ট্রের ব্যাপারে বলেছিল তখন আই এস নেতা বেছে নিয়েছিল যেখানে এই জেহাদি আন্দোলনের প্রতি সমর্থনের ভিত অত্যন্ত দৃঢ় এবং হামলার ভার বহনে সক্ষম।

কিন্তু একইসঙ্গে বাগদাদি তার সমর্থকদের কাছে 'একক নেকড়ে' আক্রমণ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, অবশ্যই যেখানে সম্ভবপর। তার ঘোষণা ছিল : 'ইসলামিক স্টেটের সৈন্যরা দিকে দিকে জেহাদের আগ্নেয়াগিরি প্রজ্বলিত করো।' 'সমস্ত একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে বিশ্বকে আলোকিত করো'— এবং এক বছরেরও বেশি সময় ধরে আই এস জঙ্গিরা তাদের স্বঘোষিত খলিফার আহ্বানে সাড়া দিয়ে চলেছে।

(মহম্মদ বাজ্জি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতায় অধ্যাপনা করেন এবং নিউজ ডে পত্রিকার প্রাক্তন মধ্যপ্রাচ্য ব্যুরো চীফ। লেখাটি সম্প্রতি হিন্দু পত্রিকায় প্রকাশিত।)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

এন এস সি এন নেতাদের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় সতর্কতা প্রয়োজন

রাজ্যে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ স্থানীয় রাজনীতি যখন শক্তিশালী হয়ে একটি রাজ্যের অথবা একাধিক রাজ্যের অংশবিশেষকে একত্র করে তার সার্বভৌমত্ব দাবি করে তখন সেই দাবি অচিরেই বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ বপন করতে শুরু করে। কালক্রমে সেই বীজ বিষবৃক্ষের জন্ম দেয়। এই মুহূর্তে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার, একদা ভয়ঙ্কর অধুনা শান্তশিষ্ট এক বিষবৃক্ষের মুখোমুখি। ন্যাশনাল সোশালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড, এন এস সি এন (ইসাক-মুইডা)-এর সঙ্গে আসন্ন শান্তি আলোচনায় কেন্দ্রীয় সরকারের যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে পদক্ষেপ করা প্রয়োজন বলে ওয়াকিবহালমহল মনে করছেন। বিশেষ করে সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটি যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে পর্যালোচনা করা খুবই জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে মুইভা (ফাইলচিত্র)।

২০১৫-র আগস্টে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে কেন্দ্রের প্রতিনিধি আর এন রবি এবং এন এস সি এন নেতা থুইনগেলেঙ্গ মুইভার মধ্যে একটি খসড়া শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও চুক্তির শর্ত মোতাবেক কাজ এখনও শুরু হয়নি। কিছুদিন আগে সার্বভৌমত্ব প্রসঙ্গে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে মুইভা, 'আমার দল সার্বভৌমত্বের দাবি থেকে এখনও সরে আসেনি' বলে মন্তব্য করেছেন। এই মন্তব্য থেকে উত্তর-পূর্বের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নতুন করে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বিশেষ করে অসম, মণিপুর এবং অরুণাচল প্রদেশে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এন এস সি এন তার জন্মলগ্ন থেকেই অসম মণিপুর অরুণাচল প্রদেশ নাগাল্যান্ড এবং মায়নামারের (!) নাগা-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে নিয়ে স্বাধীন নাগালিম রাষ্ট্রের দাবি জানিয়ে আসছে। মুইভা ছাড়া পৃথক রাষ্ট্রের দাবিদার ছিলেন এন এস সি এন (আই এম)-এর চেয়ারম্যান ইসাক চিসি সু। গত মাসে তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। এমতাবস্থায় মুইভার এ হেন মন্তব্য যুগপৎ তাঁর দল এবং সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজনীতিতে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন দিল্লীর সরকার অবশেষে নাগা ইতিহাসের বিশেষত্বগুলি বুঝতে পেরেছে। এই বোধোদয়ের প্রেক্ষিতেই নাগা-সার্বভৌমত্বের দাবি আবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। যদিও একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর, রাজ্যের আঞ্চলিক সংহতি ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোনো কাজ এন এস সি এন করবে না। নাগাস্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রধান ইস্যুগুলি সামনে রেখে একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করাই তাদের লক্ষ্য।

সাক্ষাৎকারটিতে মুইভা কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বস্তুত স্বীকার করেছেন এর আগে কোনো সরকার বা কোনো প্রধানমন্ত্রী নাগাদের সমস্যার সমাধান খুঁজতে এমন ইতিবাচক মানসিকতা দেখাননি। কোনো কোনো মহল মনে করছে সার্বভৌমত্ব নিয়ে মন্তব্য স্রেফ মুইভার রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা। তিনি ভালোই জানেন সার্বভৌমত্ব নিয়ে বেশি লেবু কচলালে নাগারা যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে যাবে। সুতরাং এখন নরেন্দ্র মোদীর ইতিবাচক মানসিকতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৮১ সালে তৎকালীন বৃটিশ সরকার নাগাদের জোর করে অসমে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো নাগা ক্লাব। এই ক্লাবের মাধ্যমেই নাগাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ১৯২৯ সালে গঠিত সাইমন কমিশনের কাছে ক্লাবের সদস্যদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, নাগাদের ভালোমন্দের বিচারের ভার নাগাদেরই দেওয়া হোক। বহু প্রাচীনকাল থেকে নাগারা স্বাধীন জাতি হিসেবে এই অধিকার পেয়ে এসেছে। একথা অনস্বীকার্য নাগাদের স্বাধীন নাগালিমের স্বপ্ন বৃটিশ সরকারের বিভাজনের রাজনীতির ফসল। যা একই সঙ্গে নাগাদের বৃটিশবিরোধী এবং ভারতের মূলস্রোতের অধিবাসীদের বিরোধী করে তোলে। ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল আশ্চর্যজনক ভাবে ৪৭-র ১৪ আগস্ট (ভারত স্বাধীনতা পাবার একদিন আগে) নাগাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার নাগাদের সমস্যাগুলি খোলা মনে বুঝতে চাইছে বলেই তারা তাদের এতদিনের সযত্নলালিত ইচ্ছের কথা ভুলে যাবেন, একথা ভাবলে অতি সরলীকরণ করা হবে। বাইরের পরিবর্তনে মন কতটা বদলাল সেটাই এখন দেখার। তাই মোদী সরকারকে পা ফেলতে হবে খুব সাবধানে। যাতে নাগাদের আহত মন আর আঘাত না পায়। সেইসঙ্গে ভারতেরও যেন অঙ্গহানি না ঘটে। ■

দেহ সংরক্ষণের জাদুকর

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এপ্রিলের ২৬ তারিখে যখন দিল্লীর জাতীয় জাদুঘরে আগুন লাগল তখন তাঁর বুক আতঙ্কে কেঁপে উঠেছিল। মনে হয়েছিল সেই বৃটিশ আমল থেকে বহু যত্ন আর পরিশ্রমে গড়ে তোলা হিরের খনিটি বোধহয় ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

জাদুঘরটি প্রাকৃতিক ইতিহাসের। আর তাঁর নাম সন্তোষ গাইকোয়াড়। এ দেশের একমাত্র ট্যাক্সিডারমিস্ট, যার বাংলা প্রতিশব্দ কোনো অভিধানেই পাওয়া যায় না। সংক্ষেপে একে মৃতদেহ সংরক্ষণের একটি পদ্ধতি হিসেবে বর্ণনা করা যায়। মূলত ছোটবড়ো নানা প্রাণী আর পাখির দেহই সংরক্ষিত হয়। কীভাবে হয় সংরক্ষণ? সন্তোষ গাইকোয়াড় জানাচ্ছেন, প্রথমে দেহ থেকে কঙ্কাল ও চামড়াটা বের করে নেওয়া হয়। তারপর মৃত প্রাণীর কঙ্কালটি তার স্বাভাবিক আকৃতি অনুযায়ী সাজিয়ে মাংস ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ফাঁপা অংশগুলি মাটি দিয়ে ভরে দেওয়া হয়। সব শেষে চামড়া দিয়ে পুরো শরীরটা ঢেকে দেওয়া। ব্যস, মডেল তৈরি। দেখলে মনে হবে জীবন্ত প্রাণী। কিন্তু কাছে গেলে ভুল ভাঙবে।

এদেশে ট্যাক্সিডারমির চল ছিল প্রায় একশো বছর আগে। তখন বৃটিশ আমল। ইংরেজদের নেকনজরে থাকার জন্য এদেশের রাজারাজড়া জমিদার থেকে শুরু করে সাধারণ ধনীরা পর্যন্ত শিকার পার্টির আয়োজন করত। তাদের বাড়ির বৈঠকখানায় শোভা পেত ট্যাক্সিডারমি করা বাঘ সিংহ!

ভারতে শিকার নিষিদ্ধ হওয়ার পর ট্যাক্সিডারমির চল উঠে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সন্তোষ গাইকোয়াড় এই বিশেষ কলাটির প্রতি আকৃষ্ট হন। সালটা ২০০৩। তখন তিনি পশু অস্থিবিদ্যার অধ্যাপক এবং একজন দক্ষ পশু চিকিৎসক।

শুরুর দিনগুলো বেশ কঠিনই ছিল। ট্যাক্সিডারমি পড়ানো হয় এরকম কোনো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজে না পেয়ে তিনি বিভিন্ন জাদুঘরে যাতায়াত শুরু করেন। দিনের পর দিন তিনি মেঝেয় শুয়ে জাদুঘরে রাখা মডেল পর্যবেক্ষণ

ট্যাক্সিডারমি করা বাঘের পাশে ড. সন্তোষ গাইকোয়াড়

করে এবং কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করে স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠেন। দক্ষতা বাড়াবার জন্য তাকে কাঠের কাজ শিখতে হয়েছে। তরল ধাতু ছাঁচে ঢেলে নির্মাণের কলাকৌশলও বাদ পড়েনি তাঁর পাঠক্রম থেকে। আর যা শিখেছেন তা হলো ছবি আঁকার রীতিপ্রকরণ।

২০০৫ সালে ট্যাক্সিডারমিস্ট হিসেবে সন্তোষ গাইকোয়াড়ের মাত্রা শুরু। মুম্বইয়ের পশু চিকিৎসা কলেজের অস্থিবিদ্যা বিভাগে পা রাখলে একটা বিরাট ফ্রিজ চোখে পড়বে। সেখানে একটা মৃত কুকুর, দুটো বিরল প্রজাতির মাছ অপেক্ষা করছে তাঁর হাতে নশ্বর থেকে অবিনশ্বর হওয়ার জন্য। তাঁর যোগেশ্বরীর বাড়িতেও এরকম একটা ফ্রিজে তিনটে পাখি অপেক্ষমান। সন্তোষবাবু এখনও পর্যন্ত ১২টি বিড়াল, ১টি কালো ভাল্লুক, ১টি হাতির মাথা, ১টি ৬ ফুট লম্বা কচ্ছপ, ১০০টি মাছ এবং ৫০০ পাখির ট্যাক্সিডারমি করেছেন।

এই কাজ করতে গিয়ে তাকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। এমনকী তার স্ত্রী ছেলেমেয়েকে নিয়ে পুরনো বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়িতে উঠে গেছেন। পুরনো বাড়িটা এখন শুধুই তার কাজের জায়গা। স্ত্রীর কথা উঠলে সন্তোষবাবু মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন পরিবারের সকলের সহযোগিতা না পেলে এ কাজ তিনি কিছুতেই করতে পারতেন না। তিনি বলেন, 'গোড়ায় আমার স্ত্রী যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। কিন্তু ইদানীং ও মরা জীবজন্তু সহ্য করতে পারে না। ট্যাক্সিডারমি হয়ে গেলেও না। আমি সারাদিন এখানে কাজ করে রাতে ফিরে যাই।'

একথা অনস্বীকার্য সন্তোষ গাইকোয়াড়ের কাজটি অন্যরকম। বিশেষ করে যেসব প্রাণীর সংখ্যা ভারতের অরণ্যগুলিতে ক্রমশ বিরল হয়ে যাচ্ছে তাদের মৃত্যুর পর মডেল করে রাখার প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে। কিন্তু সেইসঙ্গে বাড়ছে একটি আশঙ্কাও! সন্তোষবাবুর পর কে? সম্মান আর দক্ষিণা দুইই আছে তবুও আধুনিক প্রজন্ম এ কাজে আসতে উৎসাহী নয়। কথাটা তিনিও জানেন। সেইজন্যে অস্থিবিদ্যার ক্লাসে প্রায়ই ছাত্রদের ট্যাক্সিডারমি শিখে নেওয়ার কথা বলেন। কারণ তিনি যখন থাকবেন না তখন ইচ্ছে থাকলেও আর এ জিনিস দেশে শেখা যাবে না। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

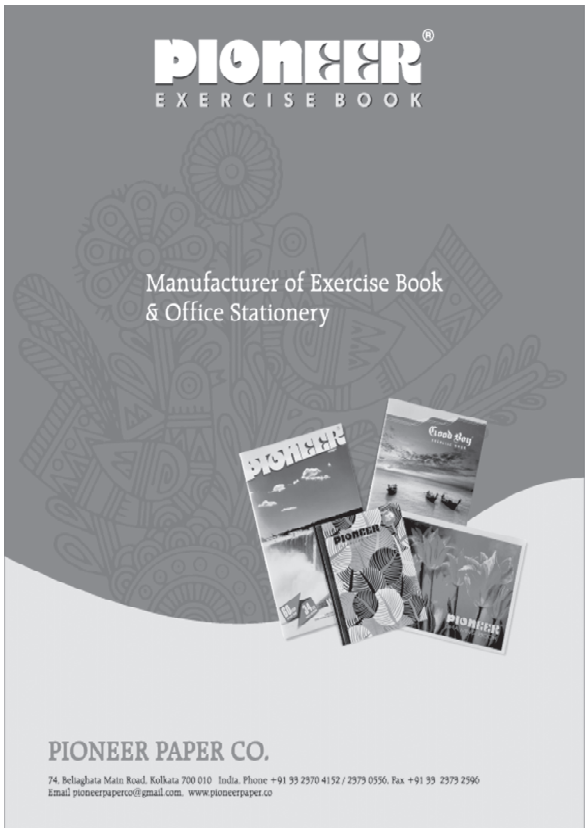

‘শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীবুদ্ধের মতোই সৃষ্টিরক্ষার দেবতা বিষ্ণুর অবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন। অতএব জীবনের অভীপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তি, দুঃখে সান্ত্বনা লাভ ও ভয়মুক্ত হবার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করাই যুক্তিসঙ্গত। তিনিই (শ্রীকৃষ্ণ) শিশু ভগবান, যিনি যমুনার তীরে অতি সাধারণ গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সকলের আদরের গোপাল, জ্ঞানী পরামর্শদাতা, সাক্ষাৎ ভগবান, সুকোমল প্রেমিক, মানবাত্মার উদ্ধারকর্তা— এমনকী আমাদের জানা আরও কত নামে তিনি সুপরিচিত।’

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

কর্মসংস্থানের স্বার্থেই অর্থনীতিতে বিদেশি লগ্নির দরজা খুলল সরকার

তারক সাহা

বর্তমানে সংবাদমাধ্যমে দুটি শব্দ নিয়ে খুব চর্চা চলছে। এর মধ্যে একটি হলো 'রেক্সিট' এবং অপরটি হলো 'ব্রেক্সিট'। এই দুটি শব্দের মধ্যে রয়েছে 'নিষ্ক্রমণ' (exit) কথাটি। দুটি শব্দের সঙ্গে অর্থনীতি যুক্ত। প্রথম শব্দটির অর্থ হলো ভারতীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বা এদেশে যার নাম রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, যার শীর্ষপদ থেকে স্বেচ্ছাপসারণ হচ্ছে বর্তমান কর্তা রঘুরাম রাজনের। আগামী ৪ সেপ্টেম্বরের পর তিনি আর ওই শীর্ষপদে থাকবেন না। ইতিমধ্যে 'ব্রেক্সিট' শব্দের অর্থ আর কারুরই জানতে বাকি নেই অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বৃটেনের বিদায়। গত ২৪ জুন ঐতিহাসিক গণভোটে ৫২ শতাংশ এবং ৪৮ শতাংশ নির্বাচকমণ্ডলীর রায়ে বৃটেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে এল। যদিও বৃটেন এই গণভোট-পরবর্তী পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। সরকারি ওয়েবসাইটে তাদের মতামত জানিয়ে এগারো লক্ষ বৃটেনবাসী ফের এই ইউনিয়নে ফেরার আর্জি জানিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে বৃটিশ সংসদে পুনরায় এ নিয়ে চর্চা হবে ফের গণভোট সংগঠিত করা যায় কিনা। বৃটেনের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী থেরেসা অবশ্য এ নিয়ে আবার গণভোটের দাবি খারিজ করে দিয়েছেন।

সাম্প্রতিককালের এই ঘটনা দুনিয়ার অর্থনীতিতে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। এই ডামাডোলের বাজারে গত ২০ জুন মোদী-সরকার একরকম বোমা ফাটালো। এযাবৎ কোনো সরকারই যা করে দেখায়নি এবার নরেন্দ্র মোদী সেটাই করে দেখালেন। নিন্দুকেরা বলছে, এই সরকারি সিদ্ধান্ত হলো বৃটেনের গণভোটের ফল। মিডিয়ার মতে, রাজন-অপসারণ ভাল মনে গ্রহণ করেনি শিল্পমহল। অনেকে বলছেন, রাজন মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে ভারতীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন রোধ করেছেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে যে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা অনাদায়ী রেখে দিয়েছে দেশের তাবড় ধূর্ত পুঁজিপতিরা (ক্রোনি ক্যাপিটালিস্টরা) তাদের বিরুদ্ধে কুঠারাঘাত করেছেন রাজন। এদেশের তাবড় 'ক্রোনি ক্যাপিটালিস্টরা' তাদের ব্যবসার মূলধন জোটাতে কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেয় এবং এই ঋণ জোটানোর ক্ষেত্রে দেশের বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকে। তাদের অঙ্গুলি হেলনে ব্যাঙ্ককর্তারা ঋণ দেন ওইসব ব্যবসায়ীদের। বছরের পর বছর অনাদায়ী ঋণ যারা নিয়েছে তাদের পর্দা ফাঁস করতেই উদ্যোগ নিয়েছিলেন রাজন। আশঙ্কা হলো রাজন বিদায়ের পূর্বেই হয়তো এইসব ঋণ-খেলাপিদের নাম ঘোষণা করে দিয়ে যাবেন। রঘুরাম রাজনের এই বিদায়পর্ব ত্বরান্বিত করতে হয়তো 'ক্রোনি ক্যাপিটালিস্টদের' হাত রয়েছে বলে মিডিয়ার জল্পনা। নিন্দুকদের মতে রেক্সিটের প্রভাবে পতন হবে দেশের শেয়ার বাজারে। কিন্তু বাস্তবে শেয়ার বেড়েছে ০.৯ শতাংশ। তবে টাকার মূল্যের যে পতনের আশঙ্কা ছিল তা রুখে দেয় দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী পদে বসেই লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণের সময়ে নরেন্দ্র মোদী আহ্বান জানিয়েছিলেন বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে ভারতে লগ্নি করার জন্য। তাঁর আহ্বানে উদাত্ত কণ্ঠে 'মেক ইন্ডিয়া'-র কথা বলেছিলেন। এই আহ্বানের অনুসারী হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার শিল্পক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বিদেশি পুঁজি নিবেশের জন্য দরজা হাট করে খুলে দেবার সিদ্ধান্ত। কেন্দ্রীয় নেতাদের মতে এই মুহূর্তে ভারতই হলো বিদেশি পুঁজি নিবেশের সবচেয়ে বড় মুক্তাঞ্চল।

অবশ্য এ নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে নানারকম মতবাদ শোনা যাচ্ছে। বামেরা স্বভাবসিদ্ধভাবে তাদের মতান্তরের কথা বলে দিয়েছে। কংগ্রেসের জুনিয়ার দোসর সিপিএম সমস্বরে বলেছে দেশ নাকি মার্কিন লবির কাছে বিকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ১৯৯১ সালে দেশের অর্থনীতি যখন খাদের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছিল সেই সময়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাওয়ের সাহসী পদক্ষেপ আজ দেশের আর্থিক গতিধারাকে পৌঁছে দিয়েছে সাড়ে সাত শতাংশে। সেই সময়েও বামেরা একইভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। জ্যোতিবাবুরা এক সময়ে দেশে কম্পিউটারের প্রবেশের বিরোধিতা করেছিল। সারা বিশ্ব এখন মুক্তাঞ্চল। প্রযুক্তির দৌলতে দুনিয়া পৌঁছে গেছে মানুষের দোরগোড়ায়। এই অবস্থায় দেশের অর্থনীতিকে বেড়া দিয়ে বিকাশের পথ রুদ্ধ করার কোনো অর্থ হয় না। বিরোধী মত যতই উচ্চকিত হোক না কেন, দেশের শিল্পমহল কিন্তু বেজায় খুশি। সি আই আই অধিকর্তা জানিয়েছেন, দেশের শিল্পে, পরিকাঠামো উন্নয়নে লগ্নি হলে দেশের জিডিপি বাড়বে, কর্মসংস্থান বাড়বে, বাড়বে করের মাধ্যমে সরকারি আয়। কাজেই এই সদর্থক আর্থিক পরিস্থিতিতে দেশের উন্নয়নের গতিধারা বাড়ছে। তবে এদের মতে সরকারি পদক্ষেপ দৃঢ় হতে হবে। ভোটের কথা চিন্তা করে দু-কদম এগিয়ে এক কদম পিছিয়ে এলে চলবে না। দেশের অর্থনীতি আজ সাবালক। এই মুহূর্তে যেটা সবচেয়ে প্রয়োজন তা হলো কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এর ফলে বাড়বে দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং বা উপভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা। চাহিদা বাড়লেই বাড়বে উৎপাদন বৃদ্ধি, বাড়বে প্রতিযোগিতা এবং সবশেষে কর্মসংস্থান। সুতরাং এদের মধ্যে দেশের অর্থব্যবস্থাকে

ফঃ ৫

সামগ্রিকভাবে ঘেরাটোপে আটকে রাখার কোনো দরকার নেই।

সবচেয়ে বড় কথা হলো যে, সরকারি আর্থিক সিদ্ধান্তের প্রভাব দেশের অর্থনীতিতে কতটা পড়ছে তা বুঝতে অন্তত এক দশক লেগে যাবে। আসলে কোনো নতুন সিদ্ধান্ত নেবার সময়ে তার ঝুঁকি অবশ্যই নিতে হবে, নইলে সবকিছুই স্থবির হয়ে পড়বে।

এবার দেখা যাক্ মোদী সরকার ভারতকে আর্থিক মুক্তাঞ্চল বানাতে বানাতে কী কী পদক্ষেপ করেছে।

(১) প্রতিরক্ষায় ১০০ শতাংশ বিদেশি লগ্নি। ৪৯ শতাংশের পর লাগবে কেন্দ্রের অনুমতি। অর্থনীতির এই মুক্তাঞ্চল অস্ত্র-সহ ছোট অস্ত্র, গোলাগুলির তৈরির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। (২) ডি টি এইচ, কেবল, মোবাইলে টিভিতে ১০০ শতাংশ বিদেশি লগ্নি। (৩) ওষুধ কারখানার পরিকাঠামো উন্নতিতে ১০০ শতাংশ বিদেশি লগ্নি। সরাসরি করা যাবে ৭৪ শতাংশ, বাকি ২৬ শতাংশের জন্য চাই সরকারি অনুমোদন। (৪) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রাণীসম্পদ বিকাশ, পশুপালন, মাছ চাষ, মৌমাছি পালনের মত ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ বিদেশি লগ্নির পথ সুগম করা হয়েছে। (৫) নতুন ও চালু বিমান বন্দরের উন্নতিতে ১০০ শতাংশ বিদেশি লগ্নির সুযোগ। দেশে বিমান পরিবহণেও ১০০ শতাংশ বিদেশি লগ্নি। ৪৯ শতাংশ ছাড়ালে সরকারি অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।

প্রতিরক্ষায় ১০০ শতাংশ বিদেশি লগ্নি প্রস্তাব কেন্দ্র গ্রহণ করায় বিরোধীকণ্ঠ 'গেল গেল' রবে সোচ্চার হয়েছে। এরা সমস্বরে বলে উঠছে এতে নাকি দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগের গোপনীয়তা প্রকাশ্যে আসবে। কিন্তু প্রযুক্তির দুনিয়ায় আর সেই গোপনীয়তা থাকছে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বহু নিন্দিত বা চর্চিত 'বোফর্স-কামান' ৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছে। এখন সেই বোফর্স-কামান নির্মাতারা ভারতে ১০০ শতাংশ পুঁজি নিবেশ করে বোফর্স-কামান যদি এদেশে তৈরি করে তাহলে আপত্তি কোথায়? প্রথমত, এর ফলে কষ্টার্জিত বিদেশি মুদ্রার সাশ্রয় হবে এবং অন্য দেশে রপ্তানির মাধ্যমে দেশের কোষাগারে মহার্ঘ বিদেশি মুদ্রা জমা পড়বে। এযাবৎ ছোট অস্ত্র নির্মাণে এক অনিশ্চয়তা ছিল। এর ফলে অস্ত্র নির্মাণ শিল্পে বড় বড় বিনিয়োগ আসেনি। দেশের অভ্যন্তরে এবং সীমান্তে সন্ত্রাসবাদীদের রুখতে ছোট অস্ত্রের প্রয়োজন নিরাপত্তাকর্মীদের জন্য। ৪৯ শতাংশ অটোমেটিক রুটে বিনিয়োগের রাস্তা খুলে যাওয়ায় বিনিয়োগকারীদের আশঙ্কা কেটে যায়। এ পর্যন্ত ২০১৪ সালে বিজেপি সরকারের দু'দুবার বিদেশি লগ্নি টানার প্রয়াস বানচাল হয়ে যায় এবং গত আর্থিক বছরে মাত্র ৬৪ লক্ষ টাকায় বিনিয়োগ এসেছে। ৪৯ শতাংশের ওপরে বিনিয়োগ প্রকল্পে লগ্নির প্রস্তাব ছিল দুর্লভ এবং মাত্র একটিই ১০০ শতাংশ প্রকল্পের প্রস্তাব এসেছে।

ডাইরেক্ট টু হোম কেবল, মোবাইল টিভি-তে ১০০ শতাংশ লগ্নির প্রস্তাবে সরকারের সায় মেলায় উজ্জীবিত হয় এই সার্ভিস সেক্টর। খাতায়, কলমে ১০০ শতাংশ অটোমেটিক রুটে এই সার্ভিস সেক্টরে নিবেশের কথা বলা হলেও কিছু অপারেটর অতটা আশাবাদী নয়। এখনও যা আইন রয়েছে তাতে গোড়ায় গলদ দেখছেন অপারেটররা। ৪৯ শতাংশের পর নিবেশের প্রশ্ন উঠলে লাল ফিতের ফাঁসের কথা বলছেন এঁরা। ৪৯ শতাংশের ওপর পুঁজি নিবেশের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিদেশি নিবেশ প্রগতি পর্ষদ (এফ আই পি বি)-র কাছে আবেদন করতে হবে। এখানেই আটকে যেতে পারে প্রকল্প। দুর্নীতির আশঙ্কাও রয়েছে এতে। যেহেতু সরকারি ঘোষণা একেবারেই টাটকা তাই এদের অনেকেই হতাশ হলেও উজ্জীবিত। তাঁরা ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ-এর মাধ্যমে সরকারি ঘোষণার ফলপ্রসূতার জল মাপতে চাইছেন।

ভেষজ বা ওষুধ শিল্পে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রক বিদেশি পুঁজি নিবেশের দরজা হাট করে খুলে দিল। এর ফলে বিদেশি ওষুধ কোম্পানিগুলি এদেশের কোনো কোম্পানি কিনে নিয়ে উৎপাদন শুরু করতে সরকারি অনুমোদনের দরকার হবে। যার জন্য এদেশে যেমন ধুঁকতে থাকা ওষুধ কোম্পানি মালিকানা হস্তান্তরের ফলে পুনর্জীবিত হয়ে উৎপাদন শুরু হবে। এমনও হতে পারে যেসব জীবনদায়ী ওষুধপত্র চড়াদামে বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় সেইসব ওষুধ অনেক কম দামে মিলতে পারে এদেশে। ওষুধ শিল্পে গবেষণার মাধ্যমে অনেক নতুন জীবনদায়ী ওষুধ তৈরি হতে পারে। নতুন কর্মসংস্থান ছাড়াও একই জেনেরিক ওষুধের মূল্য সাধ্যের মধ্যে থাকবে ক্রেতাদের।

সম্প্রতি আমাদের রাজ্যে অণ্ডাল বিমানবন্দরটি বন্ধ হয়ে গেল কেবল যাত্রীর অভাবে। শুধু তাই নয়, অণ্ডাল বিমানবন্দরটি অ-লাভদায়ক বলে রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়াও এই বিমানবন্দরটি থেকে তাদের উড়ান চালাতে চায় না। দেশে বা রাজ্যে বিমান পরিবহণ পরিকাঠামো উন্নয়নের এক অঙ্গ। অণ্ডাল বিমানবন্দর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঘরে-বাইরে এক ভুল বার্তা পৌঁছে গেছে। বিমান পরিবহণে অণ্ডাল বিমানবন্দরটি পুনরায় চালু করতে এবং সেইসঙ্গে যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তা সরকারের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ লাগু করায় সরকারের যে ১ লক্ষ কোটি টাকা বেশি ব্যয় হবে তার অর্থ সংস্থান করতে গিয়ে উন্নয়নখাতে ব্যয়ে ঘাটতি হবে। বিমান পরিষেবার আগেই ৪৯ শতাংশ লগ্নির কথা বলা থাকলেও বিদেশি অপারেটররা এতদিন উৎসাহ দেখায়নি। তবে সরকারি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দেশে বিমান পরিষেবা সংক্রান্ত স্টকে মানুষ লগ্নি করতে শুরু করেছে। ঘোষণার দিনেই দেশি স্টক মার্কেটে বিমান পরিষেবার স্টক ৬ শতাংশ বেড়ে গেছে। অভিজ্ঞ মহলের আশা যে, সরকারি ঘোষণায় দেশের উড়ান শিল্পে প্রতিযোগিতা বাড়বে আর এতে লাভবান হবে যাত্রীরা।

সবশেষে বলা যায়, ২০ জুন সরকারি সিদ্ধান্ত দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের আশা করছে সংশ্লিষ্ট মহল। সরকারি এই সিদ্ধান্তে ঝুঁকি থাকলেও দেশের পরিকাঠামো, যুবক- যুবতীদের হাতে কাজ, দেশের সার্বিক উন্নয়নে এই ঝুঁকির একটা প্রয়োজন ছিল। এছাড়া কোনো অর্থনৈতিক পরিবর্তনের চটজলদি সুফল পাওয়া যায় না। মার্কসবাদের ব্যর্থতার প্রমাণ পেতে কেটে গেছে আট দশক। সুতরাং মোদী সরকারের এই সিদ্ধান্ত সফল না ব্যর্থ তার প্রমাণ পেতে অন্তত এক দশক তো লাগবেই। ততদিন অপেক্ষা করাই শ্রেয়। ■

বাংলাদেশে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে হিন্দুরা

ধর্মানন্দ দেব

বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তার প্রশ্নটি ক্রমশ সামনে আসছে। বাংলাদেশে আজ শান্তি, সম্প্রীতি সুদূর পরাহত। নীতি ও মূল্যবোধের প্রচণ্ড শূন্যতা। হিংসায় উন্মত্ত বাংলাদেশ। এক কথায় বলা যায় কদর্য সাম্প্রদায়িকতার নগ্ন উত্থান ঘটে চলেছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের হিন্দুদের উপর নির্যাতন নতুন নয়। বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তন হলেও নির্যাতনের মাত্রার কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না। নির্যাতন ক্রমে বেড়েই চলছে। যেন বিরাম নেই। রমজান মাসের শেষ জুম্মাবারের রাত্রে ঢাকার গুলশনের হোলি আর্টিজান বেকারি রেঁস্তোরায় আক্রমণ হয়। যারা আক্রমণ করে তাদের মুখে আল্লাহ আকবর স্লোগান এবং হুকুম প্রদান করে কোরান থেকে আয়াত পাঠ করার জন্য। আর যারা আয়াত বলতে পারেনি তাদেরকেই গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে! ওইদিন অর্থাৎ রমজান মাসের শেষ জুম্মাবারের ভোরবেলা ঢাকা থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরে ঝিনাইদহে শ্রীশ্রী রাধামদন গোপাল বিগ্রহ মঠের পুরোহিত শ্যামানন্দ দাসকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়। মন্দিরে আগুন দেওয়া হচ্ছে। বোমা বিস্ফোরণ হচ্ছে। রক্তপাত ঘটছে। জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। দেব-দেবীর প্রতিমা চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছে। পৈশাচিক উন্মাদনায় ধর্ষিতা হচ্ছে নারী। বাংলাদেশ সরকার প্রথমে লোকদেখানো কিছু ধড় পাকড় করলেও যখন দেখে পরিস্থিতি ভয়াবহ তখন সত্যকে গোপন করার লক্ষ্যে এবং মুখরক্ষার তাগিদে পাঁচ বছরের জনগণনা রিপোর্ট প্রকাশ না করে Vital Sample Statistics Report প্রকাশ করে, যা এককথায় বাস্তবের সঙ্গে কোনো মিল খোঁজে পাওয়া যায় না। বাস্তবে বাংলাদেশের হিন্দু পুরোহিতরা এতই আতঙ্কিত এবং শঙ্কিত যে তালাবন্ধ মন্দিরে পূজা দিচ্ছেন এবং তাদের সাংবাদিকদের সঙ্গেও কথা বলা নিষেধ। ঝিনাইদহ সদরের চাকলাপাড়ার শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের পুরোহিত বিনয় কুমার দাস মন্দিরের দরজার বাহিরে তালা মেরে ভিতরে পূজা দিচ্ছেন। সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপর লাগাতর আক্রমণের পিছনে রয়েছে একটিমাত্র কারণ। কারণটি হচ্ছে 'এথনিক ক্লিনজিং', অর্থাৎ বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য একটি দেশে পরিণত করা।

জনগণনা অনুযায়ী বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার চিত্র

সন	হিন্দু জনসংখ্যা (শতাংশের হিসাবে)
১৯৪১	২৮.০
১৯৫১	২২.০৫
১৯৬১	১৮.০৫
১৯৭৪	১৩.০৫
১৯৮১	১২.১৩
১৯৯১	১১.৬২
২০০১	৯.২
২০১১	৮.৫

বিভাগ অনুযায়ী বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যার চিত্র

বিভাগ	হিন্দু জনসংখ্যা (শতাংশের হিসাবে)
খুলনা (১০টি জেলা)	১১.২০
চট্টগ্রাম (১১টি জেলা)	১০.৬৫
ঢাকা (১৩টি জেলা)	৮.৫০
বরিশাল (৬টি জেলা)	৯.৭০
রংপুর (৮টি জেলা)	৯.০৯
রাজশাহী (৮টি জেলা)	১০.০৯
সিলেট (৪টি জেলা)	৮.৬০
ময়মনসিংহ (৪টি জেলা)	২০১৫ সালের ১৪ সেপ্টেম্বরে আলাদা বিভাগ হয়।

এরা প্রকৃতপক্ষে চায় না বাংলাদেশে একটি হিন্দু পরিবারের অস্তিত্ব থাকুক। তাই চলছে ধারাবাহিক আক্রমণ। গত তিন মাসে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা'র মাটিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। নানাভাবে জখম করা হয়েছে হিন্দু নরনারীকে। করা হচ্ছে অপহরণ এবং দেওয়া হচ্ছে খুনের হুমকি। উদাহরণস্বরূপ একটি হুমকির ঘটনা তুলে ধরছি। সেটি হচ্ছে বাংলাদেশে এক হিন্দু পুরোহিতকে খুনের হুমকি। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান মুকুল মহারাজ গত ১৬ জুন একটি খুনের হুমকিভরা চিঠি পান। ওইদিন মিশনের প্রধান গেটের সামনে এসে লাল রঙের একটি মোটরসাইকেল থামে। চালক মোটরসাইকেল থেকে নেমে সোজা মিশনের ভিতরে চলে যায় এবং ভিতরে গিয়ে মিশনের 'অনুসন্ধান' বিভাগে এসে খামটি জমা দিয়েই বেরিয়ে যায়। ওই খামের উপর লেখা ছিল 'অত্যন্ত জরুরি' এবং মিশনের প্রধান মহারাজের নামেই ছিল। কিন্তু মিশনে প্রধান মহারাজ না থাকায়, খামটি চলে যায় সহ-সম্পাদক স্বামী দেবানন্দ মহারাজের নিকট। যেহেতু চিঠিটি ছিল 'অত্যন্ত জরুরি'। স্বামী দেবানন্দ মহারাজ খামটি খুলেন এবং পড়তেই কপালে ভাঁজ। ইসলামিক স্টেট জঙ্গি সংগঠনের 'লেটার হেডে' চিঠিটি প্রিন্ট করা ছিল। প্রেরকের জায়গায় এ বি সিদ্দিকি নাম ছিল। ঠিকানার জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে— ইসলামিক স্টেট অব বাংলাদেশ, চান্দনা চৌরাস্তা ইদগাঁও মার্কেট, গাজীপুর মহানগর। চিঠির মূল বক্তব্য এরকম :

'বাংলাদেশ একটি ইসলামিক রাষ্ট্র। তাই তুমি এ দেশে তোমার ধর্মাচরণ করতে পারবে না। তা সত্ত্বেও যদি তুমি এ দেশে তোমার ধর্মাচারণ চালিয়ে যাও, তা হলে আগামী ২০ থেকে ৩০ তারিখের মধ্যে তোমার মৃত্যু হবে।'

ওই ঘটনার ৫ দিন আগে গত ১০ জুন

শুক্রবার বাংলাদেশের রংপুরের পীরগঞ্জের সর্দারপাড়া এলাকার পুরোহিত উত্তম কুমার মোহন্তকে হিন্দুদের বিয়ে রেজিস্ট্রি করার কথা বলে নিয়ে যাওয়া হয় ওই এলাকার গাইবান্ধা কালীবাড়িতে। আর ওই কালীবাড়ি থেকেই তাঁকে অপহরণ করা হয়। বাদ যাচ্ছে না ওই দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের সম্পত্তির উপর হামলা, লুটতরাজ। বাংলাদেশ ক্রমশ পরিচিত হয়ে উঠেছে হিন্দুসহ ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে এক আতঙ্কপুরী হিসাবে। বাংলাদেশের মাগুরা জেলা পুলিশের লাঠি ও বাঁশ বিতরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা কতটুকু আতঙ্কিত। শুধু তাই নয়, হিন্দু বসতি থাকা গ্রামে গ্রামে সন্ত্রাসী কার্যক্রম প্রতিরোধের জন্য গড়ে তুলা হচ্ছে 'লাঠি-বাঁশি প্রতিরোধ কমিটি'। একদিকে লোকদেখানো প্রতিরোধ কমিটি তৈরি হচ্ছে এবং অন্যদিকে 'পুরোহিত হত্যা সংগঠন' তৈরি হচ্ছে। কেননা সম্প্রতি বরগুনা সার্বজনীন কালী মন্দিরের পুরোহিত সঞ্জয় চক্রবর্তীকে 'পুরোহিত হত্যা সংগঠন' নামধারি সংগঠনের পক্ষ থেকে হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি প্রদান করা হয়। সম্প্রতি নিহত হয়েছেন এক আশ্রমিক 'ঋত্বিক', পাবনা জেলার হেমায়েতপুরে শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সেবাশ্রমের বিশেষ দায়িত্বে থাকা ৬২ বছরের বৃদ্ধ নিত্যরঞ্জন পাণ্ডে। তাঁর বাড়ি গোপালগঞ্জ সদরের আরুয়া কংশু এলাকায়।

এই ঘটনার তিন দিন আগে ঝিনাইদহে খুন হন আনন্দ গোপাল গাঙ্গুলি নামের এক পুরোহিত। বিগত ২১ ফেব্রুয়ারি খুন করা হয় পঞ্চগড় জেলার গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ যজ্ঞেশ্বর রায়কে। ওইসব গুপ্তহত্যা থেকে রেহাই নেই স্কুল ছাত্রদেরও। ১৫ জানুয়ারি নির্মমভাবে হত্যা করা হয় নবম শ্রেণীর ছাত্র তপন ভৌমিককে। বাঙালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুরের মতো ঘটনাও ঘটে থাকে বাংলাদেশে। সম্প্রতি নিখিল চন্দ্র জোয়ারদার নামের এক হিন্দু দর্জিকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। উল্লেখিত ঘটনাগুলি ভিন্ন দেশের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত, কিন্তু অপ্রকাশিত ঘটনার খবর আমাদের অজানা। প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ঘটনা থেকে এক কথায় বলা যায় বাংলাদেশে পরিকল্পনা মাফিক হিন্দুশূন্য করা হচ্ছে। আর এর পিছনে বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ মদত রয়েছে বলা যায়। কেননা সেই দেশ থেকে বিভিন্ন সংগঠন দাবি করছে তারা মেরেছে। এক একটা হিন্দু মারছে, আর বুক ফুলিয়ে অপকর্মটি তারাই করেছে বলে স্বীকার করছে। তাই বলা যায়, এইসব ঘটনা একের পর এক করে যাওয়ার পর তাদের মধ্যে কোনো ভয় নেই। সরকার প্রায় নিশ্চুপ। আর লোকদেখানো বিরোধী দলের কিছু কর্মকর্তা বা পুরোনো কিছু দুষ্কৃতীকে পাকড়াও করে বাহবা পাওয়ার চেষ্টা করছে সরকার। কারণ হিন্দু মরলে ওই দেশের কারও কিছু হয় না। না খালেদা জিয়ার, না শেখ হাসিনার। না অন্য কোনো দলের। সত্যি বাংলাদেশে হিন্দুদের এখন করুণ অবস্থা! তাই রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইতিমধ্যে ওইসব ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনার বলেছেন— 'বাংলাদেশে মুক্ত চিন্তক, উদারমনা, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও এল জি বি টি-র সক্রিয় কর্মীদের টার্গেট করে নৃশংস হত্যাকাণ্ডগুলি নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় আমি উদ্বিগ্ন।'

বাংলাদেশে হিন্দুদের তাড়িয়ে বা দেশ ছাড়তে বাধ্য করে কী বাংলাদেশ লাভবান হতে পারবে? পাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখুন। দেশটিতে যেমন হিন্দু নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া চলছে, একইভাবে মুসলমানরা নিজেরা মারামারি করছে। সেখানে শিয়া সুন্নিদের মারছে, সুন্নিরা শিয়াদের মারছে। আর সবাই মিলে হত্যা করছে মানবতাকে। বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না থাকার কারণেই হিন্দুরা এক প্রকার নিরুপায় হয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। তাইতো ভারতে লক্ষ লক্ষ স্বীকৃত এবং অস্বীকৃত উদ্বাস্তু। বিশেষ করে ভারতের ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ এবং অসমে। তবে অসম বলতে বিশেষ করে বরাক উপত্যকার তিন জেলায়। কিন্তু ভারতের অসম রাজ্যে এসে অনেকের রেহাই নেই, কেননা বিগত রাজ্য সরকারের আমলে সরকারি পুলিশ অভিযান চালিয়ে হিন্দু শরণার্থীদের গ্রেপ্তার করা হয়। নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকায় তাদের নামের পাশে 'ডি' ভোটার হিসাবে তকমা লাগিয়ে দেয়। তাই ওইসব হিন্দুরা উভয় দেশেই বঞ্চিত হচ্ছে। যদিও বিগত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্র সরকার দু'টি নোটিফিকেশন মারফত বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু বা ওই দেশের অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের ভারতে বসবাস করার অধিকার দিয়েছে। তবে ভারতে আসতে হবে ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে। ভাবার বিষয় হচ্ছে, আজ যারা বাংলাদেশে বা পাকিস্তানে মুসলমানের কাছে নির্যাতিত বা অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন তারা যাবেন কোথায়? তারা কি মুসলমানের অত্যাচারের শিকার হয়ে ওই দেশেই মরবে? আর আমরা ভারতে সংখ্যাগুরু হয়ে ওইসব চোখ বুজে সহ্য করব, তা কখনো হতে পারে না। তাই ভারতের কেন্দ্র সরকারের উচিত আশু হস্তক্ষেপ। কারণ আসল ষড়যন্ত্রকারীদের বিষদাঁত যত শীঘ্র ভেঙে দেওয়া হবে, ততই মঙ্গল। বাংলাদেশের এই আতঙ্ক স্বাভাবিকভাবে ভারতেও উদ্বেগ ছড়াচ্ছে। পরিস্থিতির আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। আঞ্চলিক রাজনীতির কথা চিন্তা না করে ভারতে আগত বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে নির্যাতন ও অত্যাচারের শিকার হয়ে সংখ্যালঘুদের বসবাসের অধিকার দেওয়ার জন্য সেপ্টেম্বর মাসে দেওয়া ডেডলাইন উঠিয়ে দেওয়া হোক। তখনই কোনো হিন্দু ওই দু'টি দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে পারবেন যা অতি মানবিক ব্যাপার। আর যারা আঞ্চলিক রাজনীতি নিয়ে ভাবছেন তাদের উদ্দেশ্য বলছি, একদিন আপনাদের উপর এই নির্মম অত্যাচার হবে না তার গ্যারেন্টি কোথায়? সেদিন আপনাদের রক্ষায় কে ছুটে আসবে। মনে রাখবেন, বিশ্বের কোথাও আপনাদের আঞ্চলিক রাজনীতির বীজ নেই। তাই আসুন, আমরা সবাই বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে দাঁড়াই। আর যারা বিতাড়িত হয়ে ভারতে এসেছেন ক্রমশ তাদের নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করা হোক নতুবা সমগ্র বিশ্বে হিন্দু জনসংখ্যা দিনের পর দিন কমতেই থাকবে।

(লেখক একজন আইনজীবী)

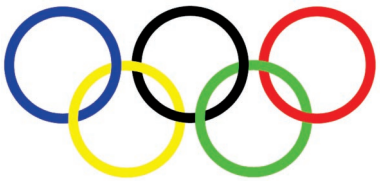

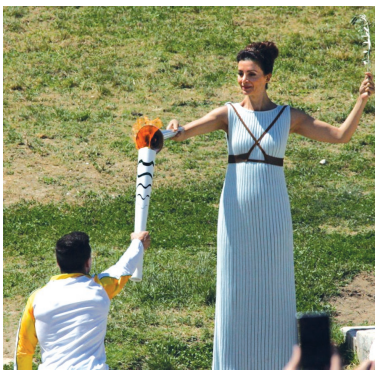

অলিম্পিক স্মৃতি, সত্তা ও ভবিষ্যৎ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেখতে দেখতে এসে গেল ৩১তম অলিম্পিয়াড। প্রতি চার বছর অন্তর বিশ্বসভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব মঞ্চ তথা যুদ্ধক্ষেত্রে ঘটে যায় কতই না অতিপ্রাকৃত ঘটনা। ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে আর কদিন পরেই শুরু হয়ে যাবে অলিম্পিকের মহাযজ্ঞ। এহেন গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে আসন্ন রিও অলিম্পিকের প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য পাঠকের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরা এবং ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বিচার বিশ্লেষণ করাই এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ শতাব্দী প্রাচীন আধুনিক অলিম্পিকের স্মৃতি, সত্তা এবং অবশ্যই এর ভবিষ্যতের দিকে ফিরে দেখা যা একপ্রকার মানবজীবন তথা সভ্যতার দায়বদ্ধতাও বটে।

২০০৯-এর সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত আই ও সি-র অধিবেশনে পাঁচটি দেশের রাজধানী শহরকে টেক্কা দিয়ে রিও ২০১৬-র অলিম্পিক আয়োজনের দায়িত্ব পায়। রিও শহরের চারটি প্রধান কেন্দ্র বেছে নেওয়া হয়েছে অলিম্পিকের ভরকেন্দ্র হিসেবে। বাবা দ্য থিজুকায় তৈরি হয়েছে গেমস ভিলেজ। থাকবেন বারো হাজার অ্যাথলিট ও কয়েক হাজার কর্মকর্তা-সহ বিভিন্ন ইভেন্ট-পরিচালকরা। পাশেই আর একটি ভিলেজে বসবাস করবেন গোটা দুনিয়ার সাংবাদিকরা। এছাড়া কোপাকাবানা বিচ, মারকানা স্টেডিয়াম ও দিওদোরো বাকি তিন প্রাণকেন্দ্র। সমস্ত ইভেন্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এই তিনটি স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। আর শহরের মধ্যিখানে অলিম্পিক পার্ক গড়া হয়েছে।

৪৩টি নতুন রাস্তা, ১০টি ফ্লাইওভার, পাঁচটি সাততারা হোটেল, নতুন একটি বিমানবন্দরও তৈরি করা হয়েছে অলিম্পিকের জন্য। কয়েক লক্ষ অলিম্পিক দর্শনার্থী পর্যটক আসবেন নানা দেশ থেকে। ১৫ হাজার গাছ লাগানো হয়েছে। এক কথায় পরিবেশ বান্ধব অলিম্পিক আয়োজনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগঠকরা। দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বড় দেশ ব্রাজিল। বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম রাষ্ট্র। এবারের অলিম্পিকও আকারে আয়তনে বিশাল। ২০৮টি দেশের বারো হাজার অ্যাথলিট ৪২টি ইভেন্টে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ২০৮টি দেশের শিল্পীরা পরিবেশন করবেন নিজ নিজ দেশের শিল্প-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রদর্শিত হবে এইসব দেশের চলচ্চিত্র, নাটকও। গেমসের মিডিয়া সেন্টারে একসঙ্গে বসে কাজ করতে পারবেন দশ হাজার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক। ফুটবলের কিংবদন্তী পেলে এবারের অলিম্পিকের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার। তাঁর রচিত ও সুরারোপিত গান যা তিনি নিজে পরিবেশন করবেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, তা অলিম্পিকের অন্যতম থিমসঙ।

মানব সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞান অলিম্পিকের সূচনা হয় খৃষ্টপূর্ব ৭৭৬-য়ে। প্রায় এক হাজার বছর চলেছিল প্রাচীন অলিম্পিক। আর আধুনিক অলিম্পিকের জন্ম ১৮৯৬ সালে। গোটা দুনিয়াকে সবদিক থেকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে এই অলিম্পিক। প্রথম মহিলা অ্যাথলিটের অংশগ্রহণ সূচিত হয় ১৯০০ সালের প্যারিস অলিম্পিকে। ১৯০৪-র সেন্ট লুই অলিম্পিকে প্রথম সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জ পদক দেওয়া হয় বিজয়ীদের যে প্রথা আজও চলে আসছে। ১৯১২-র স্টকহোলম অলিম্পিকে প্রথম ৬টি মহাদেশ থেকে প্রতিযোগীরা এসেছিলেন। অলিম্পিক পঞ্চবলয় রিং প্রথম ব্যবহার করা হয় ১৯২০-র অ্যান্টোয়ার্প অলিম্পিকে। ওই অলিম্পিকেই প্রথম শপথ গ্রহণ প্রথা চালু হয়েছিল। আট বছর পরে আমস্টারডাম অলিম্পিকে প্রথম অলিম্পিক সম্মান বহন করে নিয়ে এসে সুউচ্চ টাওয়ারে পূতাগ্নি প্রজ্বলন করা হয়।

অলিম্পিক উদ্বোধনে সবদেশের সমবেত মার্চপাস্ট ওই অলিম্পিকেই প্রথম দেখা যায়। অলিম্পিক পদকজয়ীদের নিজ নিজ দেশের জাতীয় পতাকার নীচে ভিকট্রি পোডিয়ামে উঠে দাঁড়ানোর প্রথা চালু হয় ওই অলিম্পিকেই। ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে প্রথম অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৬-র মেলবোর্নে (অস্ট্রেলিয়া)। অলিম্পিকের ম্যাসকট প্রথম আবির্ভূত হয় ১৯৭২-য়ে মিউনিখে। বিভিন্ন খেলার পেশাদার ক্রীড়াবিদরা প্রথম অলিম্পিকে অংশগ্রহণের ছাড়পত্র পান ১৯৮৪-র লস অ্যাঞ্জেলসে। বৃটিশ ইয়টম্যান (সামুদ্রিক খেলা) স্টিভ রেডগ্রেভ পরপর পাঁচটি অলিম্পিকে (১৯৮৪-২০০০) সোনা জিতে বিরল কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। আর টিম ইভেন্টে এই রেকর্ডের অধিকারী ভারতীয় হকি, আমেরিকার বাস্কেটবল ও চীনের টেবল টেনিস দল। উপসংহারে বলতে হয় সমাজ-সভ্যতা তথা বিশ্বমানবাত্মার প্রাণচেতনা অলিম্পিক আজ এক মহাজাগতিক রূপপরিগ্রহ করেছে। ■

শব্দরূপ-৭৯৭ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১		২	■	৩			
	■	৪			■	■	■
■	৫		■	৬		৭	
■		■	■	■	■		■
■		■	■	■	■		■
৮			৯	■	১০		■
■	■	■	১১			■	১২
১৩				■	১৪		

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. একটি নির্বিষ সাপ, **৩.** বৌদ্ধ সাধকদের রচিত গীতি, **৪.** ধারা, শ্রেণী, **৫.** একটি ঝাড়ুদার পাখি, **৬.** নবপত্রিকা (প্রবাদ-গণেশপত্নী), **৮.** জমির হিসাবরক্ষক কর্মচারী, **১০.** '— গড়তে বাঁদর' (বাগ্‌ধারা), **১১.** গোবর, **১৩.** ঢিল ছুঁড়লে যেটি খাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়, **১৪.** মজা, কৌতুক।

উপর-নীচ : ১. অনেক, প্রচুর, **২.** অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ছোটদের বই, **৩.** বৈদ্যকশাস্ত্রকার বিশেষ ('— সংহিতা'), **৫.** পুরাণোক্ত অভীষ্টদায়িকা গাভী, **৭.** সংসারে অত্যাসক্ত, **৯.** সাহিত্যিক সমরেশ বসু-সৃষ্ট কিশোর চরিত্র, **১০.** শয়নকারীর মাথার দিক্, **১২.** 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি — ' (বাগ্‌ধারা)।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৯৪
সঠিক উত্তরদাতা

সায়ন্তন বিশ্বাস
গায়েরকাঁটা, জলপাইগুড়ি
নগেন মুর্মু
কোটশিলা, পুরুলিয়া
সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬

শ	র	দি	ন্দু	■	কৈ	র	ব
■	■	শ	■	থ	■	হ	■
ক্ষ	■	পা	■	ক	ং	স	ক
প	রে	শ	না	থ	■	■	ল
ণ	■	■	শ	ক	র	ক	ন্দ
ক	শে	রু	ক	■	বি	■	র
■	রি	■	তা	■	য়া	■	■
বা	ফ	তা	■	আ	না	র	স

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৭৯৭ সংখ্যার সমাধান আগামী ২২ আগস্ট ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

কাশ্মীরের ৪০ লক্ষ লোক বলছে আমরা আলাদা। গোয়া বলছে আমরা আলাদা। তাদের কেউ কেউ বলছে আমরা পর্তুগিজদের ডেকে নিচ্ছি। এসব ধর্মবিরুদ্ধ। ভারতবর্ষের ৪৫ কোটি মানুষের মধ্যে ৪৪ কোটি ৯৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৯৯ জন যদি এরকম ধর্মবিরুদ্ধ কথা বলে তবে তাহলেও তা অসত্য। কিন্তু যদি একজন ব্যক্তি এর বিপরীত কথা বলে তা সত্য। কেননা তার কথা ধর্মানুকূল। সেই ব্যক্তির কর্তব্য হলো এই সত্যের ভিত্তিতে আচরণ করে অন্যদের মধ্যে পরিবর্তন আনা। তার ফলেই আর একজন ব্যক্তি ধর্মাচরণের, ধর্মের পথে কাজ করার অধিকার প্রাপ্ত করবেন।

আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার মধ্যে অথবা জনতার মধ্যে ধর্ম থাকে না। ধর্ম শাশ্বত। এজন্য গণতন্ত্রের ব্যাখ্যায় জনতার দ্বারা সরকারই পর্যাপ্ত নয়; সেই সরকার জনতার হিতের জন্যও হওয়া প্রয়োজন। জনতার হিতের সিদ্ধান্ত কেবল ধর্মের মাধ্যমেই হতে পারে। সেজন্য গণরাজ্যের ধর্মরাজ্য হওয়াও খুব জরুরি। সত্যিকারের গণতন্ত্রে স্বাধীনতা ও ধর্ম দুইই থাকবে। ধর্মরাজ্যে এ সবই সম্মিলিত হতে পারে।

জনতার মধ্যে এই ভাবনা থাকতে হবে যে, ভোটদান কেবল প্রার্থীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের হেতু নয়, বরং তাঁর ইচ্ছাকে ক্রিয়ান্বিত করার এক আদেশ-পত্র।

কোনো খারাপ প্রার্থী কোনো ভালো দলের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়েছেন বলেই ভোট চাওয়ার অধিকারী হতে পারেন না। খারাপ খারাপই। তিনি কোথাও এবং কারো মঙ্গল করতে পারেন না। দলের হাইকমান্ড এরকম ব্যক্তিকে টিকিট দেওয়ার সময় নিশ্চয় পক্ষপাত করেছে। সেজন্য এরকম খারাপ লোককে যোগ্য জবাব দেওয়ার দায়িত্ব ভোটদাতাদের।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ৩০

বিজয়ী বীরের প্রত্যাবর্তনে প্রজারা বিপুল অভ্যর্থনা জানালো।

পরে চন্দ্রগুপ্ত তথা বিক্রমাদিত্য হিন্দুকুশ পর্বত পার হয়ে গিয়ে কুশানদেরও পরাজিত করেন।

সমাপ্ত

প্রাক্তন সহ-সরকার্যবাহ সুরেশরাও কেতকরের জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক তথা প্রাক্তন সহ-সরকার্যবাহ সুরেশ রাও কেতকরের জীবনাবসান হয়েছে। গত ১৬ জুলাই শনিবার সকালে মহারাষ্ট্রের লাতুরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বৎসর।

বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। লাতুরের স্বামী বিবেকানন্দ হাসপাতালে ডাঃ অশোকরাও কুকড়ের চিকিৎসাধীন ছিলেন। উল্লেখ্য, কুকড়ে সঙ্ঘের পশ্চিম ক্ষেত্রের সঙ্ঘচালক।

মহারাষ্ট্রের পুনা শহরে তাঁর শিক্ষা ও বেড়ে উঠা। বিএসসি-বিএড পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তারপর ১৯৫২-তে সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে তিনি স্বদেশ ও সমাজ সেবার কাজে আত্মোৎসর্গ করেন। প্রথমে মহারাষ্ট্রের সাংলি, সোলাপুর, লাতুর এলাকায় সঙ্ঘের কাজের প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে তিনি মহারাষ্ট্র প্রান্তের শারীরিক প্রমুখ, ক্ষেত্র প্রচারক, অখিল ভারতীয় শারীরিক প্রমুখ, অখিল ভারতীয় প্রচারক প্রমুখের দায়িত্ব পালন করেন। কর্মসূত্রে তিনি বাংলাতেও বেশ কয়েকবার এসেছেন— কখনও শারীরিক, কখনওবা প্রচারক প্রমুখ হিসেবে। আপাত কাঠিন্যের আড়ালে তাঁর মধ্যে যে একটা দরদি মন ছিল, যে তাঁর সংস্পর্শে এসেছে সেই অনুভব করেছে। তাঁর সহজ সরল জীবন সকলের কাছে প্রেরণার পাথেয় হয়ে থাকবে।

পাকিস্তানে গুরু নানকের জন্মভিটে দুষ্কৃতীদের দখলে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাকিস্তানে গুরু নানকের জন্মভিটে নানকানা সাহিবের আশেপাশের সমস্ত জমি মুসলমান দুষ্কৃতীরা দখল করে নিয়েছে। সম্প্রতি জোর করে জমি দখল আটকাতে সরকারি নির্দেশ জারি হওয়ায় অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। কিছুদিন আগে, সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দেখাশোনার ভারপ্রাপ্ত সংস্থার অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয় দখলদারেরা। তাদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়। গোটা শহর স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের মতো পাকিস্তানেও ওয়াকফ বোর্ড সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দেখাশোনা করে। বোর্ডের প্রধান সাদিক আল ফারুক জানিয়েছেন, তাঁর সংস্থা প্রায় ১৯ হাজার সম্পত্তি দেখাশোনা করে, কিন্তু তার প্রত্যেকটিই মাফিয়ারা দখল করে নিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, পাকিস্তানের এক সাংসদ নানকানা সাহিবের সব থেকে বেশি জমি দখল করে রেখেছে।

পাঞ্জাবে কবাডির ষষ্ঠ বিশ্বকাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রতি বছরের মতো এবারও কবাডির ষষ্ঠ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পাঞ্জাবে। একথা ঘোষণা করেছেন পাঞ্জাবের উপমুখ্যমন্ত্রী সুখবীর সিংহ বাদল গত ১২ জুলাই। তিনি জানান, বিশ্বকবাডি কাপ প্রতিযোগিতা আগামী ৩ নভেম্বর শুরু হয়ে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে পাঞ্জাবের ১৪টি জেলার ১৪টি স্টেডিয়ামে। তাতে ১৪টি দেশের পুরুষ ও মহিলাদল খেলবে। বিজেতা পুরুষদলকে ২ কোটি এবং বিজেতা মহিলা দলকে ১ কোটি টাকা পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হবে। এর উদ্বোধন হবে ফাজিলকার রূপনগরে এবং সমাপ্তি হবে জালানাবাদে।

শ্রীবাদল জানান, প্রতিটি দলকে সর্বপ্রকার সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে। এর জন্য অবশ্য সব দলকে ডোপ টেস্টের জন্য তৈরি থাকতে হবে। ৪০ লক্ষ টাকা শুধু ডোপ টেস্টের জন্য ধার্য করা হয়েছে। ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সিকে ডোপ টেস্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সব খেলোয়াড়কে সবরকমের নেশা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে জানালেন কবাডি খেলা শীঘ্রই আন্তর্জাতিক মর্যাদা পেতে চলেছে।

কোরিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর রবীন্দ্র স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কোরিয়া তখন পরাধীন। রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন সে দেশে। পরাধীন দেশের কবি আরেকটি পরাধীন দেশের মানুষের দুর্দশা দেখে মনে মনে নিশ্চয়ই একাত্মতা অনুভব করেছিলেন। সেই অনুভবকে ভিত্তি করে লিখেছিলেন কবিতাও। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। কিন্তু কবিতাটি কোরিয়ার মানুষ ভোলেনি। এখনও সে দেশের শিশুরা স্কুলের বইতে কবিতাটি পড়ে। সম্প্রতি কলকাতা সফররত কোরিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ উন চ্যান চাং এই কথা বলেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনি এশিয়া- প্যাসিফিক ইকনমিক অ্যাসোসিয়েশনের দ্বাদশ বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'এই প্রথম আমি ভারতে এলাম। কলকাতায় আমার প্রধান আকর্ষণ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'ল্যাম্প অব দা ইস্ট' কবিতাটি সারাজীবন আমাকে প্রেরণা জুগিয়েছে। শুধু আমাকেই নয়, সমগ্র কোরিয়াকেই।' তিনি আরও বলেন, 'বিদেশি শাসনের যন্ত্রণা ভারতের মতো কোরিয়াও ভোগ করেছে। আমরা জাপানের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করি ১৯৪৫ সালে আর ভারত বৃটিশের কাছ থেকে ১৯৪৭ সালে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় স্বর্ণযুগে কোরিয়া কীভাবে সমগ্র এশিয়ার আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছিল তারই বর্ণনা দিয়েছেন।'

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
25 July - 2016 - Rs. 10.00,

দাম : ১০.০০ টাকা